

বুলেটিন নং: ৩২
বর্ষ ১১ সংখ্যা ১
প্রকাশ কাল: ২৫ এপ্রিল ২০০৫
ততচ্ছা মূল্য: ৳ ১০ I \$5

ইউপিডিএফ এর ওয়েবসাইট
www.updfcht.org
Email: updfcht@yahoo.com

স্বাধিকার THE SWADHIKAR

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

সাজেক এলাকায় বাঙালী পুনর্বাসনের নতুন ষড়যন্ত্র

স্বাধিকার রিপোর্ট ৯ এপ্রিল। সরকার রাসদামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নে ৬৫ হাজার বাঙালী পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র করছে বলে গোপন সূত্রে জানা গেছে। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখন সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরের অফিসার ও সরকারী কর্মকর্তা ঘন ঘন সীমান্ত এলাকা সফর করছেন। কয়েক দিনের মধ্যে ব্রিগেড কমান্ডার ও এই এলাকা সফরে আসবেন বলে সূত্র জানিয়েছে। সেনা সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হচ্ছে, যাতে ব্রিগেড কমান্ডারকে বহনকারী সামরিক হেলিকপ্টারটির সেখানে অবতরণ করতে পারে। সরকারের গোপন পরিকল্পনা মোতাবেক, বাঘাইছড়ি থেকে মাজলং পর্যন্ত বিশাল এলাকায় এসব বাঙালী পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। ইতিমধ্যে পূর্ব প্রকৃতি হিসেবে নন্দরাম নামক স্থানে একটি নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এই ক্যাম্পের পাশে সেনারা এক বাঙালি পরিবারকে বাড়ি করে দিয়েছে এবং আর জীবিকা নির্বাহের জন্য দোকানও একটা তুলে দিয়েছে। বর্তমানে বাঘাইছড়ি থেকে সাজেক পর্যন্ত সেনাবাহিনী একটি পাকা রাস্তা তৈরি করছে। এই রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হলে পুনর্বাসন জোরে শোরে শুরু করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সাজেক এলাকায় মূলত সংখ্যালঘু পাংকুয়া জাতিসত্তার বাস। এখানে বাঙালি বসতিস্থাপন করা হলে তারা তাদের জায়গা জমি থেকে উচ্ছেদ হবেন ও এতে সামগ্রিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সেনারা পাহাড়ি যুব ফোরামের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হতে দেয়নি

স্বাধিকার ডেস্ক। শান্তিপর্য সভা সমাবেশ আয়োজন ও তাতে অংশগ্রহণ সংবিধান স্মৃতি একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাও বাংলাদেশ সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত এই অধিকার হরণ করা হচ্ছে। সেখানে নিয়োজিত

সেনাবাহিনী এই অধিকার হরণ করছে। পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ কতিপয় সেনা অফিসারের কাছে জিমি। অনেক সেনা কমান্ডারের দাপট ও দৌরাডা সহনীয় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সভা সমাবেশে সেনা হামলা, সমাবেশ করতে না দেয়া, বেসামরিক প্রশাসনকে দিয়ে সমাবেশ পড়

করে দেয়ার ষড়যন্ত্র, পার্টি অফিস খুলতে না দেয়া, পার্টি কর্মি, সমর্থক ও নিরীহ লোকজনদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা, শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, অপারেশনের নামে রাত্তি বিরাতে গ্রামে গ্রামে হানা দেয়া ইত্যাদি ৭ম পাতায় দেখুন



৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে হিঙ্গা উইমেন্স ফেডারেশনের র্যালী।

ঘলাছড়ি ক্যাম্প কমান্ডারের নির্দেশ: বৌদ্ধ বিহারে মাইক বাজানো যাবে না

নান্যচর থানার ঘিলাছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মাসুদ ঘিলাছড়ি বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষকে ডেকে বিহারে আর মাইক না বাজানোর কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। গত ২৭ জানুয়ারী তিনি এই নির্দেশ দেন। কমান্ডার সাহেব বিহারাধ্যক্ষকে বলেছেন, মাইকের শব্দ শুনলে নাকি তার আরামের ঘুম হারান হয়। এছাড়া তিনি ঘিলাছড়ি বাজার ও তার আশে পাশে এলাকার বৌদ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠানের জন্য কোন ধরনের চাঁদা না তোলার জন্যও মৌখিক ডিক্রি জারি করেছেন। তার এহেন সামরিক খবরদারির কারণে ঘিলাছড়ি এলাকার বৌদ্ধ বিহারগুলোতে ভোরে ও সন্ধ্যার ধর্মীয় প্রার্থনার সময় আর মাইক বাজাচ্ছে না। অন্যদিকে ধর্মীয় চাঁদা উত্তোলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় এলাকার বৌদ্ধ বিহারগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে উঠেছে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ বিহারগুলো চলে সম্পূর্ণ দায়ক দায়িকার অর্থানুকুলে। অন্যদিকে, বৌদ্ধ মন্দিরে প্রার্থনার সময় মাইক বাজানো ও ধর্মীয় চাঁদা উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও, ঘিলাছড়ি বাজার মসজিদে আঘানের সময় প্রতিদিনই মাইক বাজানো হচ্ছে। কমান্ডার সাহেবও এই মসজিদে নামাজ আদায় করে থাকেন। তবে মাইকে আঘানের ধ্বনিতে তার ঘুম হারান হয় কিনা জানা যায়নি। তাছাড়া তিনি এই মসজিদের জন্য যে নিয়মিত চাঁদা উত্তোলন করা হয় তাও বন্ধ করে দেন নি। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে কমান্ডারের এই বৈষম্যমূলক আচরণ সংবিধানের পরিপন্থী হলেও, ঘিলাছড়িতে এখন সেটাই আইন। পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন কোন সেনা কমান্ডার দেশের সংবিধান ও আইনকে পোরাই পরোয়া করে থাকেন। এই মুহুর্তে তারা নিজেরাই আইন প্রণেতা, আইনের ব্যাখ্যা ও তারাই আইনের প্রয়োগকারী সংস্থা। এই সেনা নায়করা নিজেরাই বিচারক ও নিজেরাই জুরি।

ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত

৯ এপ্রিল ২০০৫ শনিবার পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর উদ্যোগে পুরানা পল্টনস্থ শহীদ মনির-আজাদ সেমিনার কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি শীর্ষক এক গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ এর প্রধান প্রসিদ্ধ বিকাশ সীসা। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলাদেশ লেখক শিবিরের নেতা প্রাণেশ সানাদার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা রুহিন হোসেন খ্রিস। ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় ছাত্র দলের সভাপতি প্রকাশ দত্ত, বাংলাদেশ ছাত্র কেন্দ্রের সভাপতি রহমান মিজান এবং বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সামিউল আলম রিচি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি মিঠুন চাকমা, হিঙ্গা উইমেন্স ফেডারেশনের সাবেক সভানেত্রী ও ইউপিডিএফ এর সদস্য সমারী চাকমা, পাহাড়ি যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর চাকমা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রবিশংকর চাকমা। প্রসিদ্ধ সীসা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, যারাই জনগণের আন্দোলনকে বিসর্জন দেয় তাদেরকেই পত্রপত্রিকায় হাইলাইট করা হয়। এখাবত অনেক সরকার ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান হয়নি। বিগত সরকারের আমলে যে চুক্তি হয়েছে তার ফলেও ঐ অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসেনি, যদিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর জন্য ইউনেকো শান্তি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

প্রফেসর আনু মুহাম্মদ বলেন, চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি যে বিষয়গুলোর ভিত্তিতে সমস্ত আন্দোলন করেছিলো তার কোনটাই পূরণ হয়নি। তিনি চুক্তির সমালোচনা করে বলেন, চুক্তিতে অনেক বিষয়কে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। ভূমি সমস্যা দেশীয় সাধারণ আইনের আওতায় সত্ত্ব হবে না, প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। এছাড়া জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সেটলারদের পুনর্বাসন এই ইস্যুগুলোও চুক্তিতে মীমাংসা করা হয়নি। তিনি আরো বলেন, উন্নয়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে তৎপর রয়েছে। সেখানে তেল গ্যাস উত্তোলনের ষড়যন্ত্র চলছে। এ ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদের নেতৃবৃন্দকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। তিনি বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো সামরিক শাসন জারি রয়েছে। সার্বভৌমত্বের কথা বলে সেখানে ব্যাপকভাবে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে মূলত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা জিইয়ে রাখার জন্য। ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক তথ্য খবর দেশের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। চুক্তির পরও পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের বাইরে রাখা হয়েছে। সেখানে কোন মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। সন্ত্রাসীদের লাভ হবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো সীমান্ত এলাকা এসব হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে সেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক দেয়া হচ্ছে না। তিনি ২০০৩ সালে মহালছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে হামলার পর ঐ এলাকা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন পাহাড়িদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করাই ছিল ঐ হামলার উদ্দেশ্য। হামলার জন্য স্থানীয় বাসালীদের উত্তেজিত করা হয়। বর্তমানে ইউএনডিপি ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কাজ বন্ধ রেখেছে টাকা পয়সা নেই এই কথা বলে। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা আলোচনা করতে গেলে তার রাজনৈতিক দিকটার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। পাহাড়ি

জনগণকে পাকিস্তান আমল থেকে অবিশ্বাস করা হয়ে আসছে। এই অবিশ্বাসের ভিত্তি কাটিয়ে উঠতে হবে। সারা বিশ্বে যেভাবে বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, ইউএনডিপি, এনজিও সংস্থাগুলো ভাগ করে শাসন করো নীতি কার্যকর করে চলেছে, এ দেশের সরকারও ঠিক একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাই করছে। যেভাবে দূতাবাসগুলো দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং যেভাবে শাসক শ্রেণীর দলগুলো নিজে থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে ডেকে নিয়ে আসে, সে অবস্থায় বাংলাদেশ কতটুকু সার্বভৌম সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। এরকম সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাসহ দেশের কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারে না। প্রাণেশ সানাদার বলেন, উপজাতি শব্দে আমাদের আপত্তি আছে। তাদের জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। এখাবত তাদেরকে গলা টিপে মারার চেষ্টা চলে আসছে। জোর করে পাহাড়িদেরকে তাদের জায়গাজমি থেকে উৎখাত করে সেখানে সেটলারদের বসিয়ে দেয়ার কারণে পাহাড়ি-বাঙালী কৃত্রিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। চুক্তিতে কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই, সুতরাং যে কোন সময় তা বাতিল হয়ে যেতে পারে। রুহিন হোসেন খ্রিস বলেন, চুক্তির আগে পাহাড়ি জনগণের যে ক্ষোভ-আকাঙ্ক্ষা ছিল চুক্তির পরও তা রয়েছে। চুক্তি শান্তির বাতাস বয়ে এনেছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসনের অবসান হয় না, জমি সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলো সেখানে ভোটেব রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। তিনি পাহাড়ি জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতিকে সমস্যার সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। চুক্তিকে ইন্সট্রুমেন্ট অব সারভেনার বা আত্মসমর্পনের দলিল আখ্যায়িত করে রবি শংকর চাকমা বলেন, চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যথেষ্ট পরিমাণে পাল্টে গেছে। পাহাড়িদের মধ্যে একটি অংশ শাসক গোষ্ঠির সাথে হাত মিলিয়ে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের বিরোধীতা করছে।

৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

বর্মাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ইউপিডিএফ নেতার বাড়ি তল্লাশি

গত ৪ এপ্রিল ২০০৫ দুপুর ২টার দিকে ক্যাম্পেটন তারেক (২৪ আটলারী) এর নেতৃত্বে লক্ষ্মীছড়ি জেলার অধীন বান্যাছোলা ক্যাম্প থেকে ২০ জনের একটি সেনাদল বর্মাছড়ি ইউনিয়নের বড়পাড়া গ্রামে ইউপিডিএফ নেতা রুই খই মারমার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এ সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। সেনা সদস্যরা বাড়ির জিনিসপত্র তহনছ করে দেয় ও বাড়ির লোকজনকে হরগনিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে। কি কারণে সেনারা এভাবে তল্লাশি চালিয়েছে তা জানা যায়নি। তবে তারা বেআইনী কোন কিছু পায়নি বলে জানা গেছে।

সেনাবাহিনী লক্ষ্মীছড়ি ও কাউখালিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় দিনা কারণে ইউপিডিএফ সদস্য ও সাধারণ লোকজনের বাড়িঘরে তল্লাশি চালিয়ে থাকে। শুধুমাত্র টহলের নামে গ্রামে গ্রামে হানা দেয়াও অব্যাহত রয়েছে। চুক্তির পর শান্তি বাহিনীর নেতৃত্বে বিদ্রোহের অবসান হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার হয়নি এবং সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের আগের মতোই রয়েছে।

উল্লেখ্য, রুই খই মারমার পরিবার ৯৯ সালে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যদের অভ্যুত্থানের ভয়ে কাউখালির নিজ গ্রাম চিল্যাতলি থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়। সেই পর থেকে তারা বড়তলিতে বসবাস করে আসছেন।

ভাইবোন ছড়া এলাকায় সেনা ধরপাকড় ও হরগনিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ

ডি. ডি. ত্রিপুরা। ভাইবোন ছড়া আর্মি ক্যাম্পে (সারজোন) দায়িত্বের মেজর নাসিম হোসেন-এর নেতৃত্বে একদল সেনা জোয়ান খাগড়াছড়ি থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে ববিয়য় পাড়ায় হানা দেয়। সেখানে থেকে তারা চার নিরীহ ব্যক্তিকে ধরে রশি দিয়ে বেঁধে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। পরে এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যান ও খুড় ব্যক্তির অতিভাবকরা ক্যাম্পে গিয়ে যোগাযোগ করলে সেনারা তাদেরকে "জামিনে" ছেড়ে দেয়।

আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন আনুরো চাকমা (১৮) পিতা শান্তিময় চাকমা, ভরমো চাকমা (১৯) পিতা বিজুরাম চাকমা, শান্তিময় চাকমা (২৬) পিতা জুরন ধন চাকমা এবং বাইল্যা চাকমা পিতা কালো বন্ধু চাকমা। এদিন ছিল মঙ্গলবার। ১১ জানুয়ারী সকাল ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তখন আকাশ ছিল কুয়াশায় ঢাকা ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। এই কণকণে শীতে গ্রামের লোকজন বাড়িতে আগুন জ্বেলে শীত নিবারণের চেষ্টা করছিলেন।

গত বছর ২ ডিসেম্বর রাতে একই ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা এলাকার কয়েকটি গ্রামে হানা দিয়ে যুগ্ম নারী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ সবাইকে জাগিয়ে তুলে রাস্তায় জড়ো করে। পরে হরগনিমূলক জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত ২টার দিকে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এভাবে অপারেশনের নামে রাত বিরাত্তে গ্রামে গ্রামে হানা, তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ ও এমন কি শারীরিক নির্যাতন পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ নিরীহ জনগণ এর থেকে মুক্তি চায়।

মারিশ্যায় সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ বোট চালক নির্যাতনের শিকার

ষাধিকার রিপোর্ট। গত বছর ২৫ অক্টোবর, রোজ মঙ্গলবার, রাঙ্গামাটি জেলাধীন আজাছড়া মসজিদ ক্যাম্পের মেজর শোরাফের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা এক বোট চালককে বেদম প্রহার করে। দুপুর ৩টা - ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার শিকার ব্যক্তির নাম শিতময় চাকমা, পিতার নাম দোয়ে লাল চাকমা। গ্রাম আগাছাছড়া, মারিশ্যা।

সেনারা তাকে বোট থামাতে বললে সে তা না বুঝার জন্য কিছুটা দেরী করে। পরে যখন সে বোট থামায় তখন সেনারা তাকে অমানুষিকভাবে মারতে থাকে ও অশালীন ভাষায় গালি গালাজ করে। তার বোটও তল্লাশী করা হয়।

ছেড়ে দেয়ার সময় কমান্ডার তাকে পরদিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর গঙ্গারাম লক্ষ্মীছড়ি সাব জোনে হাজির হতে বলে।

শিতময় যথাসময়ে উক্ত ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলে তাকে হারিলদার মোখলস ৩ দিন আটকিয়ে রাখে।

"তোমরা পাহাড়ি আমি বাঙালি মিল হতে পারে না"

- কুদুকছড়ি ক্যাম্প কমান্ডার

রাঙ্গামাটি জেলার কুদুকছড়ি বাজার থেকে স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা চাঁদাবাজ আখ্যায়িত করে দুই জন ধর্মীয় চাঁদা উত্তোলনকারী ও তিন জন বাজার ফাঁতের সরকারী ট্যাক্স আদায়কারীকে আটক করে। ঘটনাটি ঘটে ৯ জানুয়ারী। দিনটি ছিল কুদুকছড়ি বাজারের সাপ্তাহিক হাট বার। রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য নানান্যচর থানার সাপমারা গ্রাম থেকে ধন মোহন চাকমা (১৮) পিতা ইস্ত্র মোহন চাকমা ও লক্ষ্মী চন্দ্র চাকমা (২০) পিতা ভরগী সেন চাকমা তাদের গ্রাম থেকে বাজারে আসা লোকজনের কাছ থেকে চাঁদা তুলছিলেন। সাধারণত যে কোন সামাজিক ও ধর্মীয় চাঁদা বাজারে তোলা হয়। কারণ হাটের দিন বাজারে একসাথে সবাইকে পাওয়া যায়, আর লোকজনের হাতে নগদ টাকা থাকে। হাটের দিনে তোলা না হলে পরে গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঐ চাঁদা তুলতে হয়। এতে প্রচুর সময় অপচয় হয়। তাছাড়া গ্রামে পাহাড়ি বাড়িগুলো সাধারণত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। একটা বাড়ি থেকে অন্য একটা বাড়ির দূরত্ব অনেক। গ্রামে এত কাজের মধ্যে এভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা তোলা প্রায়শ সম্ভব হয় না। তাই বাজারে এসব চাঁদা তোলা হয়। শুধু তাই নয়, অনেক সময় গ্রামা মিত্তিঙ্গের নোটিশ বা ছোট খাট সমস্যার সমাধানও হাটের দিন বাজারে করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে বাজার ফাঁতের সরকারী ট্যাক্স

পরে স্থানীয় কার্বারী ও মুক্করীরা ২৮ অক্টোবর ক্যাম্পে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। সেনারা তাদেরকে বলে যে-ইচ্ছা করলে তারা শিশুমনিকে জেলে পাঠাতে পারে ও তার বিরুদ্ধে মামলা সাঙ্গাতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের সেনা নির্যাতন অহরহ ঘটছে। সেনাবাহিনী যতদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকবে ততদিন পার্বত্যবাসীরা শান্তিতে থাকতে পারবে না। [এই রিপোর্টটি পাঠিয়েছেন সচেতন গণস্বাস্থ্যসেবীর পক্ষে জনৈক গ্রামবাসী।]

চাঁদাবাজ দমনের নামে জুলুমবাজি

রাঙ্গামাটির কাউখালি থানার বিরাম আর্মি ক্যাম্পের জোয়ানরা বর্মাছড়ি এলাকায় চাঁদাবাজ দমনের নামে নিজেরাই জুলুমবাজি শুরু করে দিয়েছেন। গত বছরের মধ্যভাগে খিরাম আর্মি ক্যাম্পটি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। কিন্তু বর্মাছড়ি এলাকায় চাঁদাবাজ দমনের অজুহাত দেখিয়ে বছরের শেষের দিকে ক্যাম্পটি আবার চালু করা হয়। আস দু'এক এর মধ্যে দেখা গেল ক্যাম্পটি আদতে এলাকায় চাঁদাবাজি দমনের উদ্দেশ্যে বসানো হয়নি। বরং বসানো হয়েছে জুলুম করতে।

জানা যায়, ফায়ার উভ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেনারা ১৩ বাস্তিল চেইট টিন চাপের মুখে আদায় করে তাদের ব্যারাক নির্মাণ করেছে। ১৫ বাস্তিল চেইট টিন না দিলে ব্যবসার রুট বন্ধ করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার স্বার্থে তা দিতে বাধ্য হন। এভাবে সেনাদের সাথে যোগ সাঙ্গশে এলাকায় জ্বালানী কাঠ বা লাকড়ির ব্যবসা চলছে ধুমসে। ফলে পাহাড়গুলো হয়ে পড়ছে বৃক্ষহীন। ইতিমধ্যে গাছ ও লাকড়ি ব্যবসার ফলে বহু পাহাড় সম্পূর্ণ ন্যাড়া হয়ে গেছে।

অপরদিকে, চেইট টিনের পর সেনারা এবার একটা টেলিভিশন সেট ও একটা সিডি প্রেয়ার দাবি করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ব্যবসায়ী জানান, সেনাদের দাবি পূরণ না করা ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই। না হলে তাদের ব্যবসা লাটে উঠবে। সম্রাট নামে এক সেনা জোয়ান এই সব ব্যাপারে ক্যাম্প কমান্ডারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে বলে ঐ ব্যবসায়ী জানিয়েছেন।

সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটলার কর্তৃক পাহাড় দখলের চেষ্টা

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ রোজ শুক্রবার স্থানীয় বিএনপি ও সেটলার নেতা মোঃ মোস্তফার নেতৃত্বে ৩০ - ৪০ টি বাঙালী সেটলার পরিবার গভীর রাতে পাহাড়িদের জায়গায় অবস্থান নেয়। তাদের আশে পাশে নিয়োজিত থাকে সেনাবাহিনীর সদস্য। পরদিন সকালে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে তারা বাড়ি নির্মাণ শুরু করে।

জমির মালিকরা তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিবাদে জেলা

আদায়কারীরাও বাজারে নিয়ে আসা বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী থেকে সরকার নির্ধারিত হারে ট্যাক্স আদায় করে থাকে। প্রতিবারের মতো ঐদিনও বাসু চৌধুরী (৩৩), নিবারণ চাকমা (৩২) ও শ্রীতিথুর চাকমা (৩০) বাজারে ট্যাক্স আদায় করছিলেন। এমন সময় কুদুকছড়ি ক্যাম্প থেকে সেনা সদস্যরা তাদেরকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাম্পেটন মাক্কল তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাদেরকে বলেন, "তোমরা পাহাড়ি আমি বাঙালি মিল হতে পারে না"। স্থানীয় ইউপি মেম্বার, বাজার চৌধুরী ও অন্যান্য গণগম্য ব্যক্তিবর্গ আটককৃতদের মুক্তির দেয়ার জন্য সুপারিশ করতে গেলে কমান্ডার সাহেব তাদেরকে ১০০ হাত দূরে থাকার নির্দেশ দেন।

আটককৃতদের কাছ থেকে বেআইনী কোন কাগজপত্র পাওয়া না গেলেও ক্যাম্প কমান্ডার তাদেরকে রাঙ্গামাটি জোনে চালান করে দেন। জোন থেকে পরে বাজার ইজারাদার ৩ জনকে ছেড়ে দেয়া হলেও, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চাঁদা উত্তোলনকারী ধন মোহন চাকমা ও লক্ষ্মী চাকমাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য রাঙ্গামাটি কোতোয়ালি থানা কড়পক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা স্পষ্ট ভাষায় জানান, "আর্মি বড় বাবুদের নির্দেশ তাদেরকে জেলে পাঠাতে হবে। আমাদের কিছু করার নেই। আমরাতো ওদের (আর্মিদের) গোলাম।" বর্তমানে ঐ দুই জন রাঙ্গামাটি জেলে আটক-আছেন।

প্রশাসকের কাছ থেকে স্মারকলিপি দেয়, তাদের জমির বৈধ দলিলপত্র সোপর্দ করে ও এর প্রতিকার বিধানের আবেদন জানায়। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিসি ও এনপি নিজেরা ঘটনাস্থলে এসে সেটলারদের নির্মাণাধীন বাড়িঘর ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু সেটলাররা এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে। খাগড়াছড়ি পৌরসভা চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীনসহ বিএনপি নেতারা পামাটাচালায় এসে বাড়ি না ভাঙার জন্য সেটলারদের পরামর্শ দেয়। এতে সেটলাররা আরো বেশী সাহস পেয়ে যায়।

পরদিন সন্ধ্যা ৬টায় ডিসি তার অফিসে মিটিং আহ্বান করেন। এই মিটিংয়ে বিএনপি নেতারা ডিসি সাহেবকে অপদস্থ করে বলে জানা যায়। পাহাড়িদের ঐ জায়গা বেদখল করার কৌশল নিয়ে জিওসি ও ওয়ায়াদু ভূইয়ার মধ্যেও রহস্য রয়েছে বলে প্রকাশ। জিওসি জায়গা দখলের জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যবহার না করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ওয়ায়াদু সে অনুরোধ উপেক্ষা করে সেটলারদের ঐ জায়গায় বসানোর জন্য স্থানীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের মাঠে নামান।

পরে ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে সেটলাররা সরে যেতে বাধ্য হয়। স্থানীয় চেয়ারম্যান শ্রীতিবিন্দু চাকমা শান্তিপূর্ণ ও আইনী প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। অবৈধভাবে ও জোরপূর্বক জমি দখল করতে ব্যর্থ হওয়ার পর সেটলাররা মালিকানার ভূয়া দলিলপত্র দেখিয়ে মামলা দায়ের করেছে। বর্তমানে ঐ জায়গা নিয়ে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সেনাবাহিনী ঐ এলাকায় বেশ কয়েক দিন অবস্থান করে। বর্তমানে তারা সরে গেছে।

জমির মালিক পাহাড়িরা এখন দুঃস্থতার মধ্যে রয়েছেন। কারণ মামলা চালানোর জন্য যে খরচ তা অনেকটা তাদের সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া সেনাবাহিনী, প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অনেকই সরাসরি এই জমি বেদখলের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন। আর এ দেশে বিচার ব্যবস্থার ওপরও পুরোপুরি আস্থা রাখা যায় না।

মহালছড়িতে নিরীহ ব্যক্তিকে মারধর, জেলে প্রেরণ

গত ৮ ফেব্রুয়ারি রোজ মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা জেলার আওতাধীন ধুমনী ঘাটের সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক ক্যাম্পেটন রুবি ও গোয়েন্দা বিভাগের মোঃ হেলাল মহালছড়ির বৌখ নামার বাসিন্দা দুই ভাইকে অমানুষিকভাবে মারধর করে। ঐ দিন সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার শিকার ব্যক্তির নাম অংখোয়াই মারমার দুই ছেলে ধনা চান মারমা (২৮) ও রিচি প্রু মারমা। নির্যাতনের পর ধনা চান মারমাকে ছেড়ে দেয়া

হলেও তার ভাইকে আটকের দুই দিন পর থানায় চালান দেয়া হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ক্যাম্পেটন রুবি ২০-২৫ জন সৈন্য নিয়ে ভোর রাতে রিচিপ্রু মারমার বাড়ি ঘেরাও করে। এ সময় তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। সেনারা তাকে ঘুম থেকে তুলে ক্যাম্পে যেতে হবে বলে গাড়িতে তুলে সিন্দুকছড়ি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে অমানুষিকভাবে মারধর করা হয়, এমনকি কারেন্ট-এর শক দেয়া হয়। ফলে এক পর্যায়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরে তার হাতে একটি দেশীয়া গাদা বন্দুক ধরিয়ে দেয়া থানায় সোপর্দ করা হয়। বর্তমানে সে জেল হাজতে রয়েছে।

এলাকার লোকজন এর প্রতিবাদ করলে ক্যাম্পেটন রুবি তাদেরকে কড়া ভাষায় হুমকি দেন। রিচিপ্রু মারমার পরিবারের সদস্যরা জ্ঞানেন না তার অপরাধ কি। কি কারণে তাকে আটক করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। জনগণের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সাধারণ নিরীহ জনগণকে বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে এভাবে মারধর ও জেলে আটক রাখা হচ্ছে।

মহালছড়িতে শ্রীলতাহানির চেষ্টা, প্রতিবাদ করায় নির্যাতন ও জেল হাজত

গত ২৯ মার্চ বিকেল ৫টার দিকে মহালছড়ি জেলার ক্যাম্পেটন ইমন ও বিএসএম কাদের এর নেতৃত্বে ২০-২৫ জনের একটি সেনা দল ২৪ মাইল হাজাছড়া নামক গ্রামে কার্বারী অনাদী চাকমার (বয়স) বাড়ি ঘেরাও করে।

প্রথমেই সেনা জোয়ানরা অনাদী চাকমার ঘোড়শী কন্যা তেইবো চাকমার ইজ্ঞত হরণের চেষ্টা চালায়। তেইবো চাকমা নিজের ইজ্ঞত বাঁচাতে একটা খালি ষোতল দিয়ে সেনাদের আঘাত করে। এতে সেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে বুট জুতো দিয়ে তার পাছায়, পায়ে ও কোমড়ে লাঠি দেয়। ফলে তেইবো চাকমা মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। উঠাবসা পর্যন্ত করতে পারে না।

অনাদী চাকমা প্রতিকারের আশায় তার মেয়ের ইজ্ঞত হরণের চেষ্টা ও মারধরের কথা ক্যাম্পেটন ইমনকে জানায়। কিন্তু ইমন সাহেব দোষী সেনাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো তাকে ও তার বাড়িতে বেড়াতে আসা তারা কুমার চাকমার ওপর অকণা শারীরিক নির্যাতন চালায় ও আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরে তাদেরকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়। দু'জনকেই বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলে আটক রাখা হয়েছে।

তারা কুমার চাকমার বাড়ি নানান্যচর উপজেলার তারাছড়ি গ্রামে। সেদিনই তিনি অনাদী চাকমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন।

লক্ষ্মীছড়িতে সেনাদের মাস্তানীতে গাছ ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ

লক্ষ্মীছড়ির পাহাড়ি বাঙালি গাছ-বাঁশ ব্যবসায়ীরা জেলের আর্মিদের প্রতিনিয়ত হরগনিমূলক শিকার হচ্ছেন।

ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে গাছ ও বাঁশ ক্রয় করে নিয়ে যাওয়ার সময় আর্মিরা লক্ষ্মীছড়ি জেলের অধীন বান্যাছোলা আর্মি ক্যাম্পের পাশে গাছ ও বাঁশের চালিগুলো আটকায়। তারপর গাছ বাঁশগুলো আর্মি লরীতে তুলে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

গত ৩রা জানুয়ারী বান্যাছোলা ক্যাম্পের পাশে এই ঘটনা ঘটে। ব্যবসায়ীদের নিজেদের বাঁশ গাছ নিজেদেরকেই আর্মি লরীতে লোড করে দিতে হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা এখানে প্রায়শ ঘটে থাকে। এদিকে লক্ষ্মীছড়ি জেলের আর্মিরা নির্দেশ দিয়েছে যে আগে থেকে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্ধারিত স্থানে গাছ ও বাঁশ কেনা বেচা করা যাবে না। এর ফলে এলাকার জনগণের ভোগান্তি হচ্ছে। কারণ এই এলাকার অধিকাংশ লোকজন তাদের জীবিকার জন্য নিজেদের উৎপাদিত গাছ ও বাঁশের উপর নির্ভরশীল। আপে থেকে নির্দিষ্ট দিনে-ঘাটে গাছ বাঁশ কেনা বেচা করতে না পারলে তাদের আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অনেকেই বাঁশ বিক্রির পর নগদ টাকা দিয়ে বাজার থেকে চাল ডাল তেল লবন ইত্যাদি কিনে বাড়ি ফিরতে হয়। তা না হলে বাড়ির সকলকে উপোষে কাটাতে হয়।

এলাকার জনগণ লক্ষ্মীছড়িতে গাছ বাঁশ ব্যবসার ওপর সেনা হস্তক্ষেপ বন্ধের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

চাঁদা আদায় করতে গিয়ে জেএসএস সদস্য গণধোলাই-এর শিকার

গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৫ জনসংহতি সমিতির দুই সদস্য চাঁদা আদায় করতে গেলে গণধোলাই-এর শিকার হয়েছে। ঐদিন রোজ বুধবার দুপুর সাড়ে বারটার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, এ সময় মাইনী নদী দিয়ে শ্রমিকরা (বাঁশের চালি বাহক) জনৈক গাছ ব্যবসায়ীর গাছ নামিয়ে যাচ্ছিল। জনসংহতি সমিতির দুই সদস্য বানছড়া মুখ গ্রামের ভাস্কর দেওয়ান পিতা নিপুল চন্দ্র দেওয়ান ও দক্ষিণ বড়াদমের রণেল চাকমা জেএসএস দিঘীনালা শাখার সভাপতি সূশীল চাকমা ওরফে মিত্রবাবুর নির্দেশে ঐ শ্রমিকদেরকে গাছ নামানোর কাজ বন্ধ করতে বলে। জেএসএস সদস্যরা তাদের পার্টি কর্তৃক ইস্যু করা গাছ নামানোর অনুমোদনের টোকেন আছে কিনা জিজ্ঞেস করে। (উল্লেখ্য, একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকার বিনিময়ে এই ধরনের টোকেন দেয়া হয়ে থাকে।) উত্তরে টোকেন নেই বললে জেএসএস সদস্যরা বাঁশের লাঠি দিয়ে একজন শ্রমিককে আঘাত করে। এর প্রতিবাদে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্রমিকরা জেএসএস সদস্যদের ওপর বাঁপিয়ে পড়ে। যথেষ্ট পরিমাণে উত্তম মধ্যম দেয়ার পর শ্রমিকরা তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

এই ঘটনা এলাকায় বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। অনেকে এইভাবে বখাটে "দুই নামারীরা" গণধোলাই খাওয়ার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কারণ দীর্ঘ দিন ধরে এরা এলাকার সামাজিক পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলেছে। জোর জুলুম করেই তারা ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে থাকে। এভাবে উত্তোলিত চাঁদা তারা নিজেরাই ভাগবাটোয়ারা করে খায়। আন্দোলনের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে এ চাঁদা ব্যয় করা হলে লোকজন তাদেরকে চাঁদা দিতে কার্পনা করতেন না। কিন্তু এ টাকা তারা ব্যয় করে মদ ভাঙ খেয়ে। অতীতে জনগণ জেএসএস-কে চাঁদা দিতে কার্পনা করেনি। কারণ তখন জেএসএস আন্দোলনে ছিল। এখন সারেশুর ও আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায় থাকার কারণে লোকজন আর তাদেরকে চাঁদা দিতে চায় না। সে জন্য তারা জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় করে থাকে।

টুটু মনি দেওয়ান অপহৃত

২৮ জানুয়ারী জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা রাঙ্গামাটির ভেদভেদি থেকে টুটু মনি দেওয়ানকে (১৮) অপহরণ করে। টুটু মনির পিতার নাম মুদুল কান্তি দেওয়ান, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য। সে নান্যাচরের সাবেকম্যৎ এ বাকছড়ি দেওয়ান পাড়ার বাসিন্দা।

টুটু মনি ঘটনার দিন টেক্সি যোগে বিজার্ত বাজারের দিকে যাচ্ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রত্যক্ষদর্শী মহিলার ভাষ্য মতে, জেএসএস এর লোকজন টেক্সির গতি রোধ করে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে রাঙ্গাপানির সড়ক দিয়ে নিয়ে যায়। এর পর থেকে টুটু মনির আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। লোকজনের আশঙ্কা তাকে ইতিমধ্যে গুম করা হয়েছে। ঐ মহিলা আরো জানান, তিনি অপহরণকারীরা যে জেএসএস সদস্য তা নিশ্চিত ভাবে জানেন, তবে নাম বলতে পারেন না।

জেএসএস কর্তৃক এবার গরু অপহৃত

নিরীহ লোকজন অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় জেএসএস-এর একটি অতি পুরোনো ব্যবসা। তবে ইদানিং তারা কেবল মানুষ জন নয়, গরুও অপহরণ শুরু করেছে।

জানা যায়, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রঞ্জন মেঘার, তীর্থ মেঘার, ঝিমিত ও নিতাইয়ের নেতৃত্বে ২০ জনের জেএসএস-এর একটি সশস্ত্র গ্রুপ লক্ষ্মীছড়ি থানার ছোট কালাপান্যা গ্রামে ঢুকে ২৫টি গরু অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত গরুগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ইতিপূর্বে ২০০৪ সালের নভেম্বরে জেএসএস সদস্যরা বর্মাছড়ির বৈদ্যপাড়া থেকে একইভাবে ৩৫টি গরু লুট করেছিল। এ লুটতরাজে সে সময় নেতৃত্ব দেয় জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্য পূর্ণাঙ্গ চাকমা। তখন বর্মাছড়ি এলাকার জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে জেএসএস সন্ত্রাসীদের এলাকা থেকে বিতাড়ন করে অপহৃত গরুগুলো উদ্ধার করেন।

জেএসএস সশস্ত্র সদস্যদের হামলায় যুদ্ধ মনি নিহত

জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যরা কুদুকছড়িতে

সশস্ত্র সন্ত্রাস

ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি জেলা ইউনিটের সদস্য যুদ্ধমনি চাকমা (৩৫) পিতা রাজমনি চাকমাকে গুলি করে হত্যা করেছে। কুদুকছড়ি আর্মি ক্যাম্প থেকে মাত্র ২০০-২৫০ গজ দূরত্বে এই ঘটনা ঘটে।

১৯ জানুয়ারী সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে যুদ্ধমনি চাকমা কুদুকছড়ি সেনা ক্যাম্পের সন্নিহিত তিব্বা পাড়ায় তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। কিছুক্ষণ পর কুদুকছড়ি বাজারের দিক থেকে এক দল সশস্ত্র লোক তিব্বা পাড়ায় ঢুকে পড়ে। স্থানীয় লোকজন সন্ত্রাসীদের দেখতে পেলেও তাদেরকে টহলরত সেনাবাহিনীর সদস্য মনে করে প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে বিনা বাধায় তারা অগ্রসর হয়। সশস্ত্র জেএসএস-এর সদস্যরা রাস্তার পাশে সুরেশ কুমার চাকমার বাড়িতে আলাপরত অবস্থায় যুদ্ধমনিকে দেখতে পেয়ে একেবারে কাছ থেকে তাকে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর সন্ত্রাসীরা গ্রাম ও ক্যাম্প লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি ছুড়তে ছুড়তে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যায়।

এই হামলায় জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্য হিটেল, উত্তম চাকমা ও অমরসিং চাকমাসহ ২০/২২ জন সদস্য জড়িত ছিল। সেনা ক্যাম্পের নাকের উগায় এ রকম সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়ায় জনমনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

যুদ্ধ মনির লাশ ২১ জানুয়ারী যথাযোগ্য মর্যাদায় দাহ করা হয়। দাহ ক্রিয়া শেষে কয়েক শত লোক কুদুকছড়ি বাজারে জেএসএস এর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি জেলা ইউনিটের সদস্য দেবেন বিকাশ চাকমা, পরাক্রম চাকমা, জ্ঞান বিকাশ চাকমা।

বক্তারা যুদ্ধমনি হত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এই সব অপকর্মের জন্য সন্ত্রাস লারমাকে একদিন জনগণের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। জেএসএস সরকারের মদদে হত্যা ও সন্ত্রাস চালিয়ে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন থেকে ইউপিডিএফ-কে সরাতে পারবে না। বক্তারা জনগণের অধিকার কায়ম না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, সরকারের দালাল ও জুনিয়র পার্টনার সন্ত্রাস চক্রের শুভ বুদ্ধি উদয় হওয়ার কোন আলামত নেই।

যুদ্ধ মনি চাকমাকে হত্যার প্রতিবাদে ২৫ জানুয়ারী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সকাল সন্ধ্যা সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়।

বাল্যাছড়ির ভক্তপাড়ায় জেএসএস সদস্যদের গণডাকাতি

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রোজ রবিবার রাত আনুমানিক ৮ টা / ৯টার দিকে ১০ - ১২ জন সশস্ত্র জেএসএস সদস্য খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাজা থানাধীন বাল্যাছড়ির ভক্তপাড়ায় হানা দেয়। তারা গ্রামবাসীদের এক জাগরায় জড়ো করে এবং বন্দুক উঁচিয়ে সবাইকে চাঁদা দিতে বলে। চাঁদা না দিলে গুলি করে মেরে ফেলা হবে বলে তারা হুমকি দেয়। ইতিপূর্বে ঐ একই গ্রাম থেকে জেএসএস সদস্যরা ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। গ্রামের লোকজন এত দরিদ্র যে সত্যিকার অর্থে তারা দিনে আনে দিনে খায়। এত টাকা যোগাড় করে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে টাকা দিতে ব্যর্থ হলে সন্ত্রাসীরা গ্রামের প্রত্যেক বাড়িঘর লুট করে ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে চলে যায়।

সশস্ত্র জেএসএস সদস্যরা গিলাক চাকমার কাছ থেকে ৪,০০০ টাকা, শান্তিময় চাকমার কাছ থেকে ২,০০০ টাকা, লক্ষ্মীধন চাকমার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা, রুস্তি চাকমার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা, ভক্ত চাকমার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা, অশ্বিনী কুমার চাকমার কাছ থেকে ৩,০০০ টাকা, পিয়াধন চাকমার কাছ থেকে ৩,০০০ টাকা, সঞ্জীব চাকমার কাছ থেকে ৫০০ টাকা, বাদী ধন চাকমার কাছ থেকে ৫০০ টাকা, কালা চাকমার কাছ থেকে ৫০০ টাকা, প্রতুল্যা চাকমার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা, কালা চোগা চাকমার কাছ থেকে ৫০০ টাকা, নয় রঞ্জন চাকমার কাছ থেকে ৫০০ টাকা, কৃষ্ণ বিহারী চাকমার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা ও নাট্য রাম চাকমার কাছ থেকে ৫০০ টাকা জোর করে নিয়ে যায়।

মানিকছড়িতে জেএসএস কর্তৃক নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি জেএসএস সন্ত্রাসীরা এলাকার গেইদং পাড়ার রজা মার্মাকে নিজ বাড়ি থেকে দ্বিতীয়

বারের মত অপহরণ করে। এর আগে ১০ জানুয়ারি তাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করা হয়েছিল।

সন্ত্রাসীরা তাকে মারতে মারতে নিয়ে যায়। এলাকার জনগণের প্রবল চাপের ফলে জেএসএস সদস্যরা তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। একই দিন কালাপানি পাড়া থেকে জেএসএস সদস্যরা বিন্দু চাকমা নামে অপর এক ব্যক্তিকে জোর পূর্বক অপহরণ করে। দশ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

অপর এক ঘটনায় গত ১৭ ফেব্রুয়ারি জেএসএস এর একটি সশস্ত্র গ্রুপ দক্ষিণ সাপছড়ি গ্রামের আরেশি মারমা পীং চাইলাপ্রু মারমা, পাইহ্লা অং মারমা ওরফে মাঝি ও সিন্দুকছড়ির বড়ইছড়ি গ্রামের পাই প্রু মারমা পীং চাইউ মারমা - এই তিন জনকে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে যায়।

সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণ হিসেবে আরেশি মারমার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা, পাই প্রু মারমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা ও পাইহ্লা অং মারমার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা দাবি করে। পরে আরেশি মারমাকে নগদ ১৫ হাজার টাকা, পাইহ্লা অং মারমাকে নগদ ৫ হাজার টাকা ও পাইপ্রু মারমাকে ১৩ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। বাকি টাকা দুই সপ্তাহের মধ্যে দেয়া হবে বলে অঙ্গীকার দিতে হয়। সন্ত্রাসীরা আরেশে মার্মা ও পাইপ্রু মারমাকে অমানুষিকভাবে মারধর করে। অপহৃত তিন জনই ইউপিডিএফ এর সমর্থক।

লক্ষ্মীছড়ির দুলাতলীতে জেএসএস সশস্ত্র গ্রুপের নির্যাতন

লক্ষ্মীছড়ি বাজার থেকে অংসাচিং মার্মা ১৮ ফেব্রুয়ারি জেএসএস সদস্যরা এলাকার দুজুরী পাড়ার ১৯ জনের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। দিতে ব্যর্থ হলে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ঐ ১৯ টি পরিবার নিজ বাড়িঘর ছেড়ে লক্ষ্মীছড়ি সদরের আশে পাশে তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

যাদের কাছে চাঁদা দাবি করা হয় তারা হলেন বৃষ কুমার চাকমা বয়স ৬৫, জুগন্ত চাকমা পিতা বৃষ কুমার চাকমা বয়স ৩৫, ভংগ্যা চাকমা বয়স ৩৮ পিতা বৃষ কুমার চাকমা, প্রদীপ চাকমা বয়স ৩২ পিতা কৃপা মোহন চাকমা, দীপংকর চাকমা বয়স ২৮ পিতা কৃপা মোহন চাকমা, খন্যা চাকমা বয়স ৩৪ পিতা মৃত কালা চান চাকমা, স্মৃতি মোহন চাকমা বয়স ২৮ পিতা মৃত কালা চান চাকমা, রাদ কুমার চাকমা বয়স ৪২ পিতা গঙ্গা চাকমা, নতুন কুমার চাকমা বয়স ৩২ পিতা রাদ কুমার চাকমা, তিলক চাকমা বয়স ২৮ পিতা রাদ কুমার চাকমা, বিজয় চাকমা বয়স ২৭ পিতা অজ্ঞাত, মেতা চাকমা বয়স ৩২ পিতা অজ্ঞাত, কুক্যা চাকমা বয়স ২৯ পিতা অজ্ঞাত, সম্মু লাল চাকমা বয়স ৩০ পিতা মেরা কান্তি চাকমা, লক্ষ্মী লাল চাকমা বয়স ২৮ পিতা মেরা কান্তি চাকমা, লেদ চাকমা বয়স ৪৫ পিতা অজ্ঞাত, সমন্থর চাকমা বয়স ৫০ পিতা অজ্ঞাত, স্বপ্ন কুমার চাকমা বয়স ৩৫ পিতা সমন্থর চাকমা ও আশী কুমার চাকমা বয়স ৩৪ পিতা মৃত উদমনি চাকমা।

এরা সবাই দুজুরী পাড়ার বাসিন্দা। এসব অপকর্মের সাথে জড়িত জেএসএস সদস্যরা হলো লক্ষ্মীছড়ি থানাধীন দুলাতলি গ্রামের রঞ্জন চাকমা, মংশে প্রু মারমা, আকাশ মার্মা ও অংথোয়াই মার্মা, মেঘার পাড়ার ঝিমিত চাকমা (পিতা পূর্ণ মোহন চাকমা) ও তীর্থ মোহন চাকমা, খাগড়াছড়ির ইটছড়ি গ্রামের নিতাই চাকমা এবং মানিকছড়ির কালাপানি গ্রামের গুজেন্দ্র চাকমা। এদের মধ্যে অনেকেই পিসিপি নেতা মংশে মার্মার খুনের সাথে জড়িত ছিল। ধার্যকৃত ৫ লক্ষ টাকা দিতে ব্যর্থ হলে জেএসএস সদস্যরা ২১ ফেব্রুয়ারি দুজুরী পাড়া থেকে গ্রামবাসীদের মোট ২৩টি গরু লুট করে নিয়ে যায়। গরুগুলো হলো বৃষ কুমার চাকমার ৩টি, নিলন্দ চাকমার ৪টি, জুটেন ময় চাকমার ৫টি, প্রদীপ কুমার চাকমার ৪টি, শশী কুমার চাকমার ৫টি ও আগা চাকমার ২টি।

জেএসএস সশস্ত্র দলটি গরুগুলো জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা পার্শ্ববর্তী রাঙাপানি আর্মি ক্যাম্পে ও লক্ষ্মীছড়ি জোন খবর দেয়। কিন্তু সেনারা তাদের সাহায্যের আবেদনে মোটেই সাড়া দেয়নি। দুজুরী পাড়াবাসীরা জেএসএস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীছড়ি থানায় মামলা করতে গেলে লক্ষ্মীছড়ি জেনের ২-I.C. মামলা না করার নির্দেশ দেয় এবং

৩

গরুগুলো তারা উদ্ধার করে দেবে বলে জানায়। কিন্তু সেনারা গরু উদ্ধারে আজ পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

জেএসএস এর সশস্ত্র গ্রুপটি দুলাতলী ইউনিয়নের আরো অনেকের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করেছে। এদের মধ্যে মংকাচিং মার্মার কাছ থেকে ৩,০০০ টাকা, ক্রইএতালুই মার্মার কাছ থেকে ৫০০ টাকা, স্নেহ চাকমার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা, চাইহ্লাপ্রু মার্মার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা, বিমল চাকমার কাছ থেকে ২,০০০ টাকা, রবি সোনা চাকমার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা, রতন চাকমার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা, সুন্দর কুমার চাকমার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা, উদ্রাসাইন মার্মার কাছ থেকে ১৪,০০০ টাকা, হাজী আবু তাহের এর কাছ থেকে ৪,০০০ টাকা, মংসাউ মার্মার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা, মংপ্রু মার্মার কাছ থেকে ২,০০০ টাকা ও আপ্রুসি মার্মার কাছ থেকে ৩,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

জেএসএস কর্তৃক গ্রামে হামলা ও অপহরণ

গত ২৬ মার্চ শনিবার বেলা ২টার দিকে ১০/১২ জন সশস্ত্র জেএসএস সদস্য রামগড়ের বৈদ্যপাড়া থেকে দুই গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে যায়। গ্রামের পাশে একটা বিডিআর ক্যাম্প রয়েছে। কিন্তু ঘটনার সময় বিডিআর সদস্যরা ছিল নীরব।

অপহৃতরা হলেন চলাপ্রু মার্মা বয়স ৪৫ পিতার নাম মৃত মাসা মার্মা ও কান্দিয়া মার্মা বয়স ২৭ পিতার নাম থৈ অং মার্মা। এরা দুজনেই গরীব ও সহজ সরল। সন্ত্রাসীরা তাদেরকে বেদম মারধর করে ও ৬ দিন পর দশ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। জেএসএস সদস্যরা পাড়ার চা দোকানদার রুইলা কার্বারীকেও মারধর করে।

বিয়ে অনুষ্ঠানে জেএসএস সদস্যদের গুলি বর্ষণ

২ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড়ের ছোট পিলাক গ্রামে অশ্বিনী কুমার কার্বারী তার ছেলের জন্য বিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাত বারটার দিকে জেএসএস এর একটি সশস্ত্র দল তার বাড়িতে এসে এলোপাতারি গুলি বর্ষণ করে। তবে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

অনুষ্ঠানে বহু নারী পুরুষের সমাগম হয়। যখন জেএসএস সদস্যরা গুলি বর্ষণ করে তখন তারা ভিসিডি দেখছিল।

জেএসএস সশস্ত্র গ্রুপ কর্তৃক ৯ ব্যক্তি প্রহৃত

গত ২ এপ্রিল বিকেল ৩টায় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যরা গুইমারার বটতলি পাড়ায় ইউপিডিএফ সমর্থক সন্দেহে ৯ নিরীহ ব্যক্তিকে মারধর করে। এ সময় তারা বাজারে যাচ্ছিলেন। প্রচন্ড শারীরিক নির্যাতনের পর রক্তাক্ত অবস্থায় ঐদিনই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

ঘটনার শিকার ব্যক্তির হলেন সুচক্র চাকমা বয়স ১৬ পিতার নাম সুচী কুমার চাকমা ও তার ভাই সোনায়্যা চাকমা বয়স ২০, সহদেব চাকমা বয়স ২৫ পিতার নাম সতীশ কুমার চাকমা ও তার ভাই গুক্রবিন্দু চাকমা বয়স ২০, গুক্র মোহন চাকমা বয়স ৫৫ পিতার নাম সম চাকমা, প্রমীল কুমার চাকমা বয়স ২৬ পিতার নাম চন্দ্র মোহন চাকমা, মগদম চাকমা বয়স ৩০ পিতার নাম কালামো চাকমা, কুমার বাপ চাকমা বয়স বজন্দ্র চাকমা ও উল্লমনি চাকমা বয়স ২২ পিতার নাম শান্তি কুমার চাকমা। তাদের সবার বাড়ি নাক্যাপাড়া গ্রামে।

গুইমারায় সশস্ত্র জেএসএস সদস্যদের ব্রাশ ফায়ারে হত ১, আহত ২

গত ৪ এপ্রিল রাত ৮টায় আত্মসমর্পনকারী জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যরা খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারায় নাখ্যাপাড়া গ্রামে ঢুকে নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর এলোপাথারী ব্রাশ ফায়ার করলে ঘটনাস্থলে এক ব্যক্তি নিহত ও দুই ব্যক্তি আহত হয়েছে।

নিহত গ্রামবাসীর নাম কালাচেন্ডা চাকমা বয়স ২৮ পিতার নাম গুক্র মোহন চাকমা। আহত দু'জনের নাম হলো ভিন্দুক্যা চাকমা বয়স ৪৫ পিতার নাম রাজ মোহন চাকমা ও চন্দ্র চাকমা বয়স ৪২ পিতার নাম সতীশ চাকমা। ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে সেখান থেকে মাত্র একশ বা দেড় শ গজের মধ্যে রয়েছে একটি সেনা ক্যাম্প। এ সময় সেনারা ছিল নীরব। আহত ভিন্দুক্যা হলেন সেই সেনা ক্যাম্পের একজন পোর্টার বা সেনা মালামাল বাহক।

মাই লাই বা মি লাই - দক্ষিণ ভিয়েতনামের একটি গ্রামের নাম। রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাই লাই মাই লাই সম্পর্কে কম বেশী জানেন। ১৯৬৮ সালের ১৬ মার্চ সন মাই জেলার অন্তর্গত এই গ্রামে পৃথিবীর অন্যতম জঘন্যতম ও বর্বরতম গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। এই গণহত্যায় প্রায় হারায় ৫০০ নারী পুরুষ শিশু ও বৃদ্ধ। গোটা গ্রামের লোকসংখ্যা হলো মাত্র ৭০০ জন। দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর ১১তম ব্রিগেডের চার্লি কোম্পানি এই নৃশংস গণহত্যা ঘটায়। এই কোম্পানির কমান্ডিং অফিসার আর্নেস্ট মেদিনার পরিকল্পনায় প্রায় ১০০ কমান্ডার উইলিয়াম কেলি সরাসরি নেতৃত্ব দেয় এই হত্যাকাণ্ডে। পরে যুদ্ধাপরাধের দায়ে তার বিচার ও সাজা হয়।

ঘটনার পর পরই তা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা লক্ষ্যবীণ। আর্মি-রিপোর্টে এই গণহত্যাকে বিরাট সাফল্য হিসেবে দাবি করে বলা হয়: ১২৮ জন শত্রু নিহত; নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি হলো মাত্র একজন আহত (ইনি আসলে তার গিঁতলাটি পরিষ্কার করার সময় দুর্ঘটনাক্রমে পায়ে গুলি লেগে আহত হয়েছিলেন)। আর্মিদের প্রথম দিকের আভ্যন্তরীণ তদন্ত রিপোর্টেও এই ঘটনার বিকৃতি ঘটানো হয়। কর্ণেল হ্যাভারসন এপ্রিল মাসে রিপোর্ট দেন যে আনুমানিক ২০ জন বেনামেরিক লোক অসাবধানতারশতঃ এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নিয়ন্ত্রন বলেছিলেন এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষগণ ঘটনাকে ঢামাচাপা দিতে ব্যর্থ হন। যে লোকটি না হলে বিশ্ববাসী জানতো না মাই লাই -এ কি ঘটেছে সেদিন তিনি হলেন একজন মার্কিন নাগরিক বোনাম রাইডেনআওয়ার। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর নেয়ার পর ভিয়েতনাম থেকে ফিরে এসে তিনি গণহত্যার কথা জানিয়ে প্রেসিডেন্ট নিয়ন্ত্রন, পেন্টাগন, পররাষ্ট্র বিভাগ, জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ ও সংসদ সদস্যদের চিঠি লেখেন। তার প্রচেষ্টায় তদন্ত হয় এবং প্রকাশ পায় যে একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। তবে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মার্কিন জনগণ এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। পরে টাইম ও নিউজউইক এই গণহত্যা সম্পর্কে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

সেইমুর হারশ (Seymour Hersh) নামে একজন মার্কিন সাংবাদিক বিভিন্ন জনের কাছ থেকে নেয়া ব্যাপক সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে ফলাও করে প্রতিবেদন ছেপে প্রকৃত ঘটনা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন। (বিশ্বখ্যাত এই সাংবাদিক সম্প্রতি ইরাকের আবু গারিব জেলে বন্দীদের ওপর মার্কিন সৈন্যদের অমানবিক নির্যাতনের কাহিনীও ফাঁস করে দিয়েছেন)। এছাড়া লাইফ ম্যাগাজিনে আর্মিদের নিজস্ব ফটোগ্রাফার হিবারলি কর্তৃক তোলা ছবি ছাপা হয়। তিনি ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

মার্কিন সরকার একজন ট্রি স্টার জেনারেল উইলিয়াম পীয়ারস এর নেতৃত্বে সীমিতভাবে ঘটনা তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি ৩৯৮ জনের কাছ থেকে ২০,০০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং উজন খানেক সৈন্যের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, হত্যা অথবা ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার সাথে জড়িত থাকার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। তার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রথম দিকে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত হলেও, পরে মাত্র কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিচার হয় এবং কেবল উইলিয়াম কেলিকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ঘটনার অন্যতম হোতা কর্ণেল হ্যাভারসনকে কোর্ট মার্শালের বিচারে সকল অভিযোগ থেকে খালাস দেয়া হয়। পিয়ার্স এর প্রতিবাদে লেখেন, I cannot agree with the verdict. If his actions are judged as acceptable standards for an officer in his position, the Army is indeed in deep trouble. অর্থাৎ আমি এই রায়ের সাথে একমত নই। যদি তার কাজকে তার পদমর্যাদায় আসীন অফিসারদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সত্যি সত্যি সেনাবাহিনী গভীর সংকটে পড়তে বাধ্য।

চার্লি কোম্পানির কমান্ডিং অফিসার আর্নেস্ট মেদিনার বিরুদ্ধে ১০২ জন ভিয়েতনামীকে হত্যার অভিযোগ করা হয়। Lie detector এর সাহায্যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু বিচারকরা শেষ বেলায় তাকেও অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়। কেবল লেঃ কেলিকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। তিন বছর পূর্ববন্দীর পর ১৯৭৪

ভিয়েতনামের মাই লাই ও পার্বত্য চট্টগ্রামের লোগাং

রবি শঙ্কর চাকমা



তন্মিত লোগাং গুচ্ছগ্রাম। এখানেই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। ছবিটি ২৮ এপ্রিল ১৯৯২ লোগাং লংমাঠের সময় তোলা হয়। বর্তমানে সেটলাররা এ গ্রামটি পুরোপুরি দখল করেছে।

সালে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে তিনি বিয়ে করেন এবং জর্জিয়ায় তার শ্বশুর এর জুয়েলারী দোকানে চাকরি নেন। এখানে আর্মি হেলিকপ্টার পাইলট টীফ ওয়ারেন্ট অফিসার হার্গ টমসন সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সির ট্রেনিং এর নামে সৈন্যদের মানবিক মূল্যবোধ লুপ্ত করে দেয়ার যে প্রক্রিয়া চলে তা থেকে খুব কম সংখ্যক সেনা অফিসারই মুক্ত হতে পারেন। ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে হার্গ টমসনকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। তিনি ঘটনার দিন সকাল ৮টা হেলিকপ্টার উড়িয়ে মাই লাই গ্রামের কাছে আসেন। সেখানে তিনি দেখতে পান গ্রামের মধ্যে এখানে ওখানে মৃত ও অর্ধমৃত লোকজন ছড়িয়ে ছিড়িয়ে পড়ে আছে। তিনি আরো দেখতে পান যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে খুব কাছ থেকে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে। তিনি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে ঘটনা অবহিত করেন এবং কন্টারিট নামান। তখনো যে কমান্ড ভিয়েতনামী জীবিত ছিলেন তাদেরকেও মেরে ফেলার জন্য উইলিয়াম কেলির সৈন্যরা উদ্যত। টমসন মার্কিন সেনা ও ভিয়েতনামীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাধা দেন এবং আহতদের হেলিকপ্টারে করে সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যান।

ভিয়েতনামের মাই লাই গণহত্যার মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও উজন খানেক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। গণহত্যা তখনই সংঘটিত করা হয় যখন সেনাবাহিনী পুরো জনগণকে শত্রু হিসেবে মনে করে। ভিয়েতনামে নিয়োজিত মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত ছিল, তা হল কোন মৃত ব্যক্তি সে যদি সাদা চামড়াধারী না হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে ভিয়েতকং অর্থাৎ ভিয়েতনামী মুক্তিযোদ্ধা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে বলতে গেলে, যখনই মুজিব লায়নকে উদ্দেশ্য করে বলেন "লারমা ভূমি বেশী বাড়াবে তোমাদের এলাকায় দুই লাখ, তিন লাখ, দশ লাখ ব্যক্তি চুকিয়ে দেবে" অথবা যখন জনৈক সেনা কমান্ডার পানছড়ির এক মিটিঙে ঘোষণা দেন "আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ চাই না, মাটি চাই" তখনই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নীতি প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্রের এই নীতি প্রত্যেক পাহাড়িকে সন্ত্রাস্য শত্রু জ্ঞান করে ও সেই মোতাবেক বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক গণহত্যা ভিয়েতনামের মাই লাইকেও হার মানাতে সক্ষম। লোগাং গণহত্যা তার মধ্যে একটি। ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল সংঘটিত এই গণহত্যায় কত শত নিরীহ নারী পুরুষ বৃদ্ধ শিশু কেমন নৃশংসভাবে প্রাণ হারিয়েছেন তা এখনো অজ্ঞাত। মাই লাই গণহত্যার মতো বাংলাদেশ

সেনাবাহিনীর সদস্যরাও লোগাং গণহত্যা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা কম করেনি। ঘটনার পরদিনই পত্রিকা রিপোর্ট বের হয়: ১ জন বাঙালী ও ১০ জন পাহাড়ি নিহত। এর পর সরকারীভাবে ১০ জনের জায়গায় ১২ জন পাহাড়ি নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়। অন্য অনেক গণহত্যার মতো লোগাং গণহত্যার খবরও হয়তো চাপা পড়ে যেতো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে সময় বৈসার্বিতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে দেশের ২৮ জন খ্যাতিমান লেখক, সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, ছাত্র নেতা ও মানবাধিকার কর্মী ঝাংড়াছড়ি গিয়েছিলেন। ঘটনার পরদিনই তারা সেখানে পৌঁছান। তারা ঘটনাস্থলে যেতে চাইলে সেনাবাহিনী তাদেরকে বাধা দেয়। গণহত্যার কথা সেনাবাহিনী অস্বীকার করে। সে সময়কার কুখ্যাত দালাল সমীর্ণ দেওয়ান শাপলা চত্বরে আয়োজিত এক সমাবেশে বলে যে কোন গণহত্যা সংঘটিত হয়নি। বরং সেনাবাহিনীকে বিশ্বতকর অবস্থায় ফেলার জন্য পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাদের দ্বারা এ ঘটনা সাজানো হয়েছে বলে সে অভিযোগ করে। কিন্তু সেনাবাহিনী ও তার দালালদের এ ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমন্ত্রিত অতিথিরা আসল ঘটনা জানতে সক্ষম হন এবং তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত পরিস্থিতি দেশবাসীকে

জানিয়ে দেন। দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রতিবাদ ও বিকোভের মুখে তৎকালীন রিএনপি সরকার ঘটনার একমাস পর বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়। (ইনি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান)। ঘটনার ৫ মাস পর ১৯৯২ সালের ১৭

অক্টোবর সরকার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে। খান সাহেব রিপোর্টে যা লেখেন তা সেনাবাহিনীর কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি এবং তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হন ও এমন সুপারিশ করেন যা রীতিমত গ্যা শিউরে উঠবার মতো। রিপোর্টের এক জায়গায় তিনি বলেন, "the safety of Bengali community is in danger" অর্থাৎ বাঙালীদের নিরাপত্তা বিপদাপন্ন। এর প্রতিকারের বিধান হিসেবে তার সুপারিশ হলো: বাঙালীদেরকে অবশ্যই নিজস্ব গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। সন্দেহ নেই, দুনিয়ায় এমন সুপারিশ নজীর বিহীন। যাত্রা আক্রমণকারী, গণহত্যার সাথে যারা ছিল যুক্ত, তাদের জীবনই বিপদাপন্ন বলে তিনি রায় দিলেন। যারা গণহত্যার শিকার হলো তাদের জীবনের নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত হবে সে ব্যাপারে তিনি টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। এই ছিল বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের সেদিনের বিচারের বাণী।

নিহতের সংখ্যা সম্পর্কেও তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা হলো ছবছ আর্মিদের ভাষা। তিনি বলেন, "In these view of evidence and circumstances, I have no hesitation to hold that the number of deaths did not exceed more than 12 tribals and the number of huts burnt were admittedly about 550." অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রমাণ ও ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা বিচারপূর্বক আমি নিশ্চিন্দায় বলবো যে, নিহত উপজাতীয়ের সংখ্যা ১২ এর বেশী অতিক্রম করেনি এবং পুড়ে যাওয়া বাড়িঘরের সংখ্যা হবে ৫৫০।

খান বাহাদুর আরো বেশ কিছু জঘন্য সুপারিশ করে এমন সুলতানী বাহাদুরী দেখিয়েছেন যা রীতিমত সেনাবাহিনীকে নর হত্যায় উৎসাহ দেয়ার সামিল। সেগুলো এখনো আর উল্লেখ করতে চাই না। শুধু একটা কথা বলতে চাই, তার রিপোর্ট প্রকাশের পরের বছর অন্য একটা গণহত্যা সংঘটিত হয় রাসামাটি জেলার নান্যাচরে। এই গণহত্যায়ও অনেক নিরীহ পাহাড়ি প্রাণ হারিয়েছিলেন।

অন্য অনেক বিষয় বাদ দিলেও, কারা গণহত্যা ঘটিয়েছে, কিভাবে ঘটিয়েছে, কি উদ্দেশ্যে ঘটিয়েছে সুলতান হোসেন খানের রিপোর্টে তার কিছুই উল্লেখ ছিল না। তদন্তের নামে এ ছিল এক নিষ্ঠুর প্রহসন।

মাই লাই গণহত্যাকে মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং ঘটনার সাথে জড়িত সেনা অফিসারদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আনা হয়। দোষী মার্কিন সেনা অফিসারদের উপযুক্ত শাস্তি হয়নি এবং পরবর্তীতে উইলিয়াম কেলির শাস্তিও মওকুফ করা হয়েছে এক কথা সত্যি, কিন্তু এ বিচার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ বিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য সেইমুর হারশ এর মতো মানবতাবাদী সাংবাদিকদের অবদানও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মাই লাই ও লোগাং এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলোর একটি হলো ঘটনা তদন্তের ক্ষেত্রে। মাই লাই এর ক্ষেত্রে একজন সামরিক জেনারেল ঘটনা তদন্ত করে কেবল গণহত্যার সাথে জড়িতদের বিচারের সুপারিশ করেছিলেন তাই নয়, তিনি ঘটনা ধামা চাপা দেয়ার সাথে জড়িতদেরও বিচারের আওতায় আনার সুপারিশ করেছিলেন। অপরদিকে, লোগাং গণহত্যা তদন্ত করেছিলেন একজন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি। তিনি গণহত্যা সংঘটনকারী বাডআর, আনসার, ভিডিপি ও সেটলারদের বিচার করার সুপারিশতো দুইয়ের কথা, উল্টো তিনি তাদেরকে আরো সশস্ত্র করা ও কার্যত এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে উৎসাহিত করেছিলেন।

ভিয়েতনামে মাই লাই গণহত্যার শহীদদের রক্ত বৃথা যায় নি। ভিয়েতনামী জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দীর্ঘ ৩০ বছর মরণ পণ লড়াই করে তাদের জন্য ভূমি থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। হাজার হাজার টন বোমা ফেলে নিরীহ লোককে হত্যা করে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েও স্বাধীনতাকামী ভিয়েতনামী জনগণকে পদানত করা যায়নি। বরং এই অসম যুদ্ধে দুনিয়ায় সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শৌচনীয় পরাজয় ঘটেছিল। আমেরিকার তুলনায় ভিয়েতনামীরা বলতে গেলে লাঠি সোটা নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। ভিয়েতনামীদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ, শ্রবল স্বাধীনতা স্পৃহা ও অদম্য মনোবল বিশ্ববাসী মুক্তিকামী বিপ্লবীদের এখনো প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

মার্কিন সরকার কেবল নরহত্যা ও দমন পীড়ন চালিয়ে ভিয়েতনামীদের পদানত করতে চেয়েছিল তাই নয়। তারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে পুতুল সরকার বসিয়ে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা চালায়। ভিয়েতনামীদের মধ্য থেকে সুবিধাবাদী ধাক্কাবাজদের নিয়ে "রাজাকার" সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে গেরিলা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে আন্দোলন দমনের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। কিন্তু লড়াইয়ে ভিয়েতনামী জনগণ একতাবদ্ধ হয়ে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ও সকল অপশক্তিকে পরাস্ত করে নিজেদের দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে লোগাং গণহত্যায় শহীদদের রক্তের ঋণ এখনো শোধ হয়নি। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এখনো চলছে। অসংখ্য গণহত্যা, নিষ্ঠুর দমন পীড়ন এবং ষড়যন্ত্র-বিভেদ নীতি সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের লড়াই জনগণের সংগ্রামী মনোবল এখনো অটুট রয়েছে। আত্মমর্যাদাশীল জাতি ও জনগণ কখনো মাথা নত করেন না। শেষে মাই লাই ও লোগাং গণহত্যায় শহীদদের প্রতি গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধাভিবেদন। ০

নিউ ইয়র্কের একটি আদালত ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় রাসায়নিক অস্ত্র “এজেন্ট ওরেঞ্জ” এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত একশ জনের অধিক ভিয়েতনামী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার শুনানী শুরু করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের পর ভিয়েতনামীদের দ্বারা আইনগত প্রতিকার চাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম। এই মামলায় ক্ষতিপূরণ ও ৩০টিরও বেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দূষিত হওয়া এলাকাগুলো সাফ করার আর্জি জানানো হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ডাও কেমিক্যাল (Dow Chemical) ও মোনাসান্তো (Monasanto)। এই দুই প্রতিষ্ঠানই সবচাইতে বেশী এজেন্ট ওরেঞ্জ উৎপাদন করে থাকে।

আবহমান কাল ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভাষাভাষী ১৩টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে অতীতে যেমন কোন হিংসা বিদ্বেষ ছিল না, বর্তমানেও নেই। পারাস্পরিক সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তারা আবদ্ধ। আমাদের মাঝে ছিল ঐক্য ও সমঝোতা। কিন্তু নিয়তির কি পরিহাস! বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা বড়ই করুণ ও মর্মান্তিক। এখন ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি ও ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত চলছে। খুন, অপহরণ, চাঁদাবাজি বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে অহরহ ঘটছে।

কিন্তু কেন এই হানাহানি? কেন ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত?? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের পিছনের দিকে অর্থাৎ ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ম জাতির ইতিহাস ছিল গৌরবের ও বিজয়ের ইতিহাস। আমরা মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। আমরা কারো অধীনে থাকতে চাইনি। আমরা সংগ্রাম করেছি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমাদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য। জন্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। দশ ভাষাভাষী ১৩টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বাধিকার ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমরা ঐতিহাসিকভাবে সংগ্রামী জাতি। সংগ্রাম

যুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্রের শিকার ভিয়েতনামীরা আমেরিকার আদালতে

ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন বাহিনী ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ওরেঞ্জ এজেন্টসহ আনুমানিক ২০ মিলিয়ন গ্যালন উদ্ভিদ-নিধনকারী কেমিক্যাল জাতীয় পদার্থ ছিটিয়ে দেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনামের গেরিলা বাহিনীকে খাদ্য ও বনজঙ্গলের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করা। কিন্তু এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলো কয়েক দশক ধরে পানি ও মাটিতে থেকে যায়।

বিগত বছরগুলোতে কয়েক লক্ষ ভিয়েতনামী ও ভিয়েতনামে যুদ্ধ করতে যাওয়া হাজার হাজার মার্কিন সৈন্য বিভিন্ন ধরনের ভয়াবহ শারীরিক বিকৃতিতে

ভোগেন। এজেন্ট ওরেঞ্জ-এর নামের উৎপত্তি হলো রাসায়নিক পদার্থটির ধারণকারী বস্তুর রঙ থেকে। ভিয়েতনামে দুঃস্বপ্নময় গর্ভজাত বিকলাঙ্গের জন্য এই ওরেঞ্জ এজেন্টকে দায়ি করা হয়। সেখানে দ্বি-মস্তক বিশিষ্ট বা কোন কোন সময় চোখ ও হাত ছাড়া শিশুর জন্ম হয়।

অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন সৈন্যরা উদ্ভিদ-নিধনকারী কেমিক্যাল পদার্থের সংস্পর্শ থেকে সৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার কথা জানিয়েছেন। এজেন্ট ওরেঞ্জ এর মধ্যে থাকা একটি উপাদান ডাইয়োক্সিন ক্যান্সার, গর্ভজাত বিকৃতি ও শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের

বিকলাঙ্গ হওয়ার কারণ বলে জানা যায়। প্রতিকার প্রত্যাশী ভিয়েতনামীরা এই মামলায় জিততে পারবেন কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে ১৯৮৪ সালের এক চুক্তির মাধ্যমে ডাও ও মোনাসান্তো ১ কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন সৈন্যদেরকে ১৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়ার নজির রয়েছে। মার্কিন সরকার তার কেমিক্যাল পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট মারাত্মক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ে আলোচনা করতে সব সময় অস্বীকার করে আসছে।

উৎস: রেডিও হাভানা কিউবা এবং Star Week End Magazine, March 18, 2005.

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সমস্যা ও বাস্তবতা

জয়েশ চাকমা

আমাদের রক্তে জড়িয়ে আছে।

কিন্তু এত বছর সংগ্রামের পর আমরা কি পেয়েছি? শুধুই তো দেখি সন্তানহারা দুঃখিনী মায়ের করুণ আর্তনাদ। পুত্রহারা পিতার নীরব ক্রন্দন। আজো পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে অঘোষিত সামরিক শাসন। আজো সেনা শাসন জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। বাঙালী শাসক গোষ্ঠি কখনো চায়নি আমরা

আমাদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে।

আমরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাই। এ জন্য আমাদের মধ্যে দরকার সুদৃঢ় ঐক্য। সরকার চায় আমাদের মধ্যে বিভেদ থাকুক চিরকাল। তারা চায় আমরা নিজেরাই হানাহানি করে শেষ হয়ে যাই। সবার প্রশ্ন কার স্বার্থে ও কার ইচ্ছনে পার্বত্য চট্টগ্রামে

পাঠক মঞ্চ

[এই কলামে প্রকাশিত মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব। এর জন্য স্বাধিকার সম্পাদক মন্তব্য দায়ি নয়। লেখকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার আসল নাম গোপন রাখা হলো।]

আমাদের অধিকার নিয়ে সমমর্যাদার সাথে বেঁচে থাকি। তারা আমাদের চিরকাল দমিয়ে রাখতে চায়। তারা চায় না আমাদের ভাষা সংস্কৃতি রক্ষা হোক। তাই তারা সুপারিকল্পিতভাবে ইসলামী আগ্রাসন চালাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটিলার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জারী রাখা হয়েছে? এর উত্তর হচ্ছে সরকার ও তার দালালদের রাজনৈতিক স্বার্থে। এই হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আজকের বাস্তবতা। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এক কালের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন জেএসএস প্রতিষ্ঠিত

জেএসএস কর্তৃক আটক ও টাকা ছিনতাই

গত বছর ১১ ডিসেম্বর পূর্ণাঙ্গ চাকমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির একটি সশস্ত্র দল মরাচেঙে গ্রামের মদন চাকমাকে মন্যটেক এলাকা থেকে আটক করে। জেএসএস সদস্যরা তার কাছ থেকে ৭০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

জেএসএস সদস্যরা এক ব্যক্তিকে গুম করেছে

গত বছর ২৬ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ৮টার সময় সিদ্ধার্থ চাকমার নেতৃত্বে জেএসএস সদস্যরা নান্যাচর বাজার থেকে বাদিবুজ্যা চাকমা (৪০) পিতা সান্তনু চাকমাকে অপহরণ করে। অনেক খোঁজখুঁজির পরও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে সন্ত্রাসীরা তাকে গুম করেছে।

সেনা সদস্য কর্তৃক দুই ব্যক্তি আটক

গত ৩ জানুয়ারী রাত ৯টার সময় নান্যাচর টি এন্ড টি বাজার থেকে সেনা সদস্যরা দগজ্যা চাকমা (সুভাষ) ও কান্দারা চাকমা (অতল) নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোন মামলা ছিল না বলে জানা গেছে।

জেএসএস সদস্য কর্তৃক দুই ইউপি সদস্য লাঞ্চিত

৪ জানুয়ারী জেএসএস সদস্য সিদ্ধার্থ চাকমা দুই ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য উদাস চাকমা ও অশ্বিনী কুমার চাকমাকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করে। ঐদিন দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মেম্বারদের লাঞ্চিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকার লোকজন সিদ্ধার্থ চাকমাকে খুঁজতে থাকে। গণরোধের ভয়ে সিদ্ধার্থ চাকমা বোট যোগে রাঙ্গামাটি পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে স্থানীয় চেয়ারম্যান থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

একদিকে মামলা ও অন্যদিকে জনরোধের ভয়ে সিদ্ধার্থ চাকমা আর নান্যাচরে আসতে রাজী নয়। ফলে নান্যাচরে আর জেএসএস এর কার্যক্রম চালানোর মতো কেউ নেই। এর অর্থ হলো নান্যাচর এলাকা থেকে জনসংহতি সমিতির উচ্ছেদ হওয়া। সে জন্য জেএসএস নেতৃত্বদে যে কোন প্রকারে থানায় যোগাযোগ করে সিদ্ধার্থকে নান্যাচরে পাঠাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে জানা গেছে।

নান্যাচর সংবাদ

জেএসএস কর্তৃক বিনিময় চাকমা অপহৃত

১৪ জানুয়ারী জেএসএস এর সশস্ত্র গ্রুপের সদস্য পূর্ণাঙ্গ চাকমার নেতৃত্বে ২০/২২ জনের একটি দল নান্যাচর উপজেলাধীন মিলন্যা পাড়ায় হানা দিয়ে বিনিময় চাকমা (৪০) পিতা বুদ্ধ কিঙ্কর চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে তার মুক্তিপণ হিসেবে এক লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সাপমারায় আর্মি অপারেশন, লোকজনকে হয়রানি

১৫ জানুয়ারী মেজর শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে বুড়ীঘাট আর্মি ক্যাম্পের ১০-১২ জনের একটি সেনা দল সাপমারা গ্রামে অপারেশনে যায়। এ সময় সেনা সদস্যরা অমিয় লাল চাকমাকে মুরগী আনার জন্য বলে। কিন্তু অনেক খোঁজা খুঁজি করেও তিনি কারো কাছ থেকে মুরগী সংগ্রহ করে দিতে ব্যর্থ হন। মুরগী যোগার করতে না পারার কথা সেনাদের বললে তারা রেগে যায়। তাদের কয়েকজন মস্তব্য করে “শালা, সন্ত্রাসীরা মুরগী দিতে বাধা দিয়েছে। একজন সন্ত্রাসী ধরতে পারলে পাড়ার সব যুবকদেরকে সন্ত্রাসী বলে চালান দেয়া হবে।”

মেজর শহীদুল ইসলাম স্কুল ছাত্র রমেল চাকমাকে তাকে (মেজরকে) সালাম করতে বাধ্য করে বলে জানা গেছে। পরদিন অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারী উক্ত মেজর তার দল বল নিয়ে ভাঙামুড়া গ্রামে হানা দেয়। এ সময় মেজর সাহেব বিনা অনুমতিতে দেবচন্দ্র কাব্বারী ও বুড়ীঘাট ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বার কল্পনা চাকমার বাড়িতে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীতে বেআইনী কোন কিছু উদ্ধার করতে সে ব্যর্থ হয়। বাড়ি তল্লাশীতে ক্ষান্ত না হয়ে মেজর সাহেব সন্তান সন্তরা উক্ত মহিলা মেম্বারের শরীর তল্লাশী করতে উদ্যত হয় এবং তার গায়ে হাত দেয়। কল্পনা চাকমা এর কড়া প্রতিবাদ করলে মেজর শহীদুল চুপসে যায়।

এর কয়েকদিন পর ১৯ তারিখ উক্ত মেজর তার কয়েক জন সেনা নিয়ে কাউল তুলী গ্রামে প্রদীপ কুমার চাকমা ও বিনয় চাকমার বাড়ি এবং নির্মলেন্দু হেডম্যানের দোকানে তল্লাশী চালায়। এছাড়া তারা গ্রামের অনিল চাকমার নৌকা ও বাড়িতেও তল্লাশী চালায়। কি উদ্দেশ্যে এ তল্লাশী তা জানা যায়নি।

তবে এ যাবত সে বেআইনী কোন কিছু কোন তল্লাশী থেকে পায়নি। তবুও কেন এ ধরনের অযাচিত সেনা অপারেশন ও তল্লাশী চালানো হচ্ছে তা সাধারণ জনগণ জানেন না। তাদের প্রশ্ন কত আর হয়রানি ও অপমানের শিকার হতে হবে তাদের।

সেনা কর্তৃক তিন ব্যক্তি আটক

গত ২৬ জানুয়ারী নান্যাচর জোনের সেনা সদস্যরা রাঙ্গামাটি থেকে ফেরার পথে যাত্রীবাহী লঞ্চ থামিয়ে জ্যোতি বিকাশ চাকমা (২৫) পিতা ইন্দু বিকাশ চাকমা, সুরথ রঞ্জন চাকমা ওরফে বাঙ্গাল্যা (৩৫) পিতা কালি প্রসন্ন চাকমা ও রিন্টু চাকমা (২৫) পিতা কল্পনা রঞ্জন চাকমাকে আটক করে। তাদের সবার বাড়ি নান্যাচরের ফিরিঙ্গি পাড়ায়।

জেএসএস কর্তৃ ইউপিডিএফ সদস্যসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী জেএসএস এর কুখ্যাত সদস্য সিদ্ধার্থ চাকমা, পাপুল চাকমা ও সুমন্ত চাকমা ইউপিডিএফ সদস্যসহ অপর কয়েকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে।

মামলার এজাহারে তারা অভিযোগ করে যে, ইউপিডিএফ এর সদস্যরা দক্ষিণ ফিরিঙ্গি পাড়ার দেব চাকমা ও জ্যোতি বিকাশ চাকমাকে অপহরণ করেছে। অপহরণকারী আখ্যায়িত করে ইউপিডিএফ সদস্য ছাড়াও নান্যাচর সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদেরকেও এই মামলায় জড়িত করা হয়েছে। ইউপিডিএফ এর যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তারা হলেন ১. জুয়েল চাকমা গ্রাম কুদুকছড়ি, ২. বিপুলান্ন চাকমা গ্রাম পাতাছড়ি, ৩. সুকমল চাকমা গ্রাম টিএন্ডটি, ৪. রনু চাকমা গ্রাম বেতছড়ি, ৫. পঞ্চনন চাকমা, চেয়ারম্যান, নান্যাচর ইউনিয়ন, ৬. সেন্টু চাকমা, মেম্বার পাতাছড়ি এবং ৭. নীর দেওয়ান, মেম্বার নতুন বড়াদাম।

কথিত অপহৃতদের একজন ইউপিডিএফ এর সক্রিয় সদস্য ও অপরজন সমর্থক। সুতরাং তাদেরকে ইউপিডিএফ অপহরণ করতে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। মূলত: জেএসএস সদস্যরা নান্যাচরে

তাদের নিজেদেরই অপকর্ম আড়াল করার জন্য এ ধরনের মিথ্যা মামলা সাজিয়ে রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে চাইছে।

সশস্ত্র জেএসএস সদস্য কর্তৃক অপহরণ, মারধর ও মুক্তিপণ আদায়

নান্যাচরের ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের গোড়া কাবা গ্রাম থেকে ২০ জানুয়ারী জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা প্রীতিশ্বর চাকমা (৩০) পিতা আনন্দ সুর চাকমা ও অমর চাকমা (২৮) - এই দুই ব্যক্তিকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

ঘটনার দিন ২০ -২২ জন সশস্ত্র জেএসএস সদস্য হিটেলের নেতৃত্বে গোড়া কাবা গ্রামে এসে প্রীতিশ্বর চাকমা ও অমল চাকমাকে ধরে গ্রামের বাইরে নিয়ে যায়। সেখানে কোন কারণ ছাড়া তাদেরকে মারধর করা হয়। প্রীতিশ্বরের কাছ থেকে নগদ ১৫,০০০ টাকা মুক্তিপণ আদায় করার পর জেএসএস সদস্যরা দ্রুত পালিয়ে যায়।

অপহৃতদেরকে ছেড়ে দেয়ার সময় এই বলে হুমকি দেয়া হয় যে, এই অপহরণ, মারধর ও মুক্তিপণ আদায়ের কথা যাতে কখনো কোনভাবে প্রচার না হয়, বিষয়টি ভবিষ্যতে কোনভাবে ফাঁস হলে তাদেরকে খুন করা হবে।

রামগড়ে সেনা নির্বাতন

১ম পাতার পর

(৪০) পিতার নাম দুর্গ মোহন চাকমা। এরপর সেনারা হৃদয়মনি কাব্বারী পাড়া থেকে ৭ জন গ্রামবাসীকে সিন্দুকছড়ি জোনে ধরে নিয়ে যায়। এরা হলেন এরেন্ডা চাকমা (২৮), নিপন চাকমা (২২), সমজ্যোতি চাকমা (১৮), নুংগ চাকমা (২২), অরুণ চাকমা, জটিল্যা চাকমা (২২) ও শশীময় চাকমা (২৫)। জোনে নেয়ার পর সেনারা জটিল্যা চাকমা ও শশীময় চাকমাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গুইমারা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। বাকিদের ছেড়ে দেয়া হয়। একইভাবে সেনারা পাইল্যা ভান্সা থেকে আরিশে কাব্বারীকে ধরে নিয়ে এসে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। বর্তমানে এই তিন জনকে অস্ত্র মামলায় আটক দেখিয়ে জেল হাজতে রাখা হয়েছে।

পিসিপি রাজশাহী শাখার পরিচিতি সভা ও চা চক্র অনুষ্ঠিত

গত ৭ জানুয়ারী ২০০৫ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় এক পরিচিতি সভা ও চা চক্রের আয়োজন করা হয়।

এই সভার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আগত সকল নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে রাবিতে অধ্যয়নরত পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বৃদ্ধি পাবে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, কোটার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবির ব্যাপারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আশ্বাস বাণী শোনালেও বাস্তবে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

পিসিপি রাবি শাখার সভাপতি সুনির্মল চাকমার সভাপতিত্বে সভায় বক্তারা রাবিতে ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতি তার বক্তব্যে নবীনদের উদ্দেশ্যে বলেন, সুশিক্ষা ব্যতীত একটি জাতি যেমন উন্নত হতে পারে না তেমনি আন্দোলন সংগ্রাম ব্যতীত জনগণের প্রকৃত মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। খাগড়াছড়ির সাংসদ কর্তৃক বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো চিঠির (উপজাতি কোঠা বাতিলের আহ্বান সম্বলিত) তীব্র মিন্দা জানিয়ে সভাপতি বলেন, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে নিশ্চিত ও উগ্রসাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উসুইচিং মারমা, রাসকিন চাকমা ও চিংলাং চৌধুরী। নবাগতদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উচিংমা চৌধুরী ও উক্যানু মারমা। সভা পরিচালনা করেন পিসিপি রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রিকো চাকমা।

রাজশাহীতে পিসিপি কাউন্সিল ও বিদায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ৮ এপ্রিল পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক আয়োজিত বিদায় অনুষ্ঠান ও একই সাথে পিসিপি রাজশাহী মহানগর ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সুনির্মল চাকমা। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছাত্রনেতা দীপংকর ত্রিপুরা ও রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি রূপন চাকমা। বিদায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দগু ও প্রচার সম্পাদক হৃদয় চাকমা এবং কাউন্সিল অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রিকো চাকমা। পরে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি রাজশাহী মহানগর ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি গঠন করা হয়। মহানগর শাখায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে রূপন চাকমা ও প্রণতি দেওয়ান পুনর্নির্বাচিত হন। অন্যদিকে সুনির্মল চাকমা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন হৃদয় চাকমা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ তবনের ১১৯ নং কক্ষে সকাল ১০টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু ও বিকেল ৪টায় শেষ হয়।

জাতীয় অবমাননা দিবস উপলক্ষে কাউখালিতে সমাবেশ

১০ ফেব্রুয়ারি জাতীয় অবমাননা দিবস উপলক্ষে ইউপিডিএফ কাউখালি ইউনিট কলেজ মাঠে এক সমাবেশের আয়োজন করে। অমর চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শান্তি দেব চাকমা, সর্বোত্তম চাকমা ও চরণসিং ভট্টসহ। বক্তারা বলেন, ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সরকার ও সন্ত্রাসী লারমা চক্র খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে পাহাড়ি জনগণকে অপমানিত করেছে। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

সমাবেশ শেষে একটি বিশাল মিছিল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ২০১, ড. কুদরত-ই-খুদা হল (পুরাতন), বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা - ১২০৯

শেষের পাতা

ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে তিন জুম্ম নারীর করুন আর্টি আমরা আমাদের স্বামী হত্যার বিচার চাই

বিউটি চাকমা, সঞ্জিতা চাকমা ও সাধনা চাকমা সুদূর কুদুকছড়ি থেকে ঢাকা এসেছেন তাদের স্বামী হত্যার বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করার জন্য। এর আগে তারা কেউ ঢাকায় আসেন নি। আসার প্রয়োজনও পড়ে নি। গ্রামে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার সামলাতেই তাদের সময় চলে যায়। এখন উপায়ান্তর না দেখে ঢাকা আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের দুঃখের কথাগুলো সাংবাদিকদের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানাতে।

এই তিন মহিলার স্বামীদের জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা খুন করে। তারা জানে না তাদের স্বামীদের অপরাধ কি? এবং কেনই বা তাদের হত্যার বিচার হবে না।

১১ এপ্রিল ঢাকায় সাধিকার প্রতিনিধি তাদের সাথে একান্তে কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলন তো রাস্তামাটিতেও করা যেতো -এভাবে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন রাস্তামাটিতেও তারা নিরাপদ বোধ করেন না। কারণ জেএসএস-এর সদস্যরা রাস্তামাটি শহরে তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে পর্যন্ত যোগাযোগ করতে দেয় না। রাস্তামাটি শহরে তারা যেতে পারেন না।

বিউটি চাকমার বয়স ২৫ বছর হবে। তার এক মেয়ে নয় বছর বয়স, নাম লুচিনী চাকমা। বিউটি চাকমার স্বামী প্রাক্তন সুবলং ইউপি চেয়ারম্যান বীর চাকমাকে গত ২০ মার্চ কুদুকছড়ি বাজারে জেএসএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে। সন্তাসীরা গাড়িতে করে ফিল্ম কায়দায় কুদুকছড়ি বাজারে যায় এবং নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে অনেকে আহত হয়। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পথে বীর চাকমা মারা যান।

বিউটি চাকমাদের নিজ বাড়ি হলো রাস্তামাটি জেলার সুভলং এ, হাজাছড়া গ্রামে। জেএসএস এর অত্যাচারে এক বছর আগে (মার্চ ২০০৪) তারা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্তমানে তারা কুদুকছড়ির বাদলছড়ি গ্রামে অস্থায়ীভাবে বসবাস

দিঘীনালায় আঞ্চলিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় দপ্তর "পৃথিবীর যাহা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর" এই শ্লোগান সম্বলিত ব্যানারে ইউপিডিএফ দীঘীনালা ইউনিটের উদ্যোগে ১১ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২টায় বাবুছড়া মুখ হাইস্কুল মাঠে এক নারী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে দীঘীনালা এলাকার দেড় হাজারের অধিক নারী এতে অংশগ্রহণ করেন। ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমার সভাপতিত্বে সহযোগী সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা, পাহাড়ি যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর চাকমা, পিসিপির সাবেক সভাপতি মিঠুন চাকমা ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সহ-সম্পাদক মলিনা চাকমা। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাবুছড়া ইউনিয়নের

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর এলাকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে নারীদের এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সোনালী চাকমা ও সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে চঞ্চলা চাকমা ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ইউপিডিএফ-এর খাগড়াছড়ি ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক সচিব চাকমা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পাহাড়ি যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর চাকমা ও পিসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক রিকো চাকমা বক্তব্য রাখেন।

করছেন। বিউটি চাকমা বলেন, "জেএসএস যতদিন থাকবে ততদিন সুভলং যাওয়ার কোন অবস্থা নেই। বাড়ির সব জিনিসপত্র ফেলে আসতে হয়েছে। এগুলো আমার স্বামীর বড় ভাইয়ের বাসায় আছে। শুনেছি জেএসএস এর লোকজন এ সব জিনিসপত্র ও সম্পত্তির লিষ্ট তৈরি করেছে।"

তিনি বলেন, সুভলং আসল হোতা হলো ভরুণ জ্যোতি। সে শান্তি বাহিনীতে ছিল। তার অত্যাচারে এলাকার জনগণ সুখে থাকতে পারে না।"

বীর চাকমারা চার ভাই এক বোন। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে (২০০২) তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা তাকে নির্বাচন না করার জন্য হুমকি দেয়। প্রচারণায়ও বাধা দেয়। কিন্তু তা উপেক্ষা করে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ধারণা করা হয় তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু কারচুপি করে তাকে হারানো হয়। তিনি ১৯৯২ সালে সুভলং ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি জেলার শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান মনোনীত হন এবং সরকারী খরচে নেপাল সফর করেন।

জেএসএস ইতিপূর্বে তাকে বহুবার হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিল। নির্বাচনে জেতার পর পরই জেএসএস-এর অধুনা বিলুপ্ত শান্তি বাহিনী তাকে অপহরণ করে ও পরে ৮০ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। তার ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়।

চুক্তির পরও জেএসএস তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এক বছর আগে সুভলং বাজারের কাছে সশস্ত্র জেএসএস সদস্যরা তাকে খুন করার চেষ্টা চালায়। দিনের বেলায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তিনি সুভলং বাজারের কাছে তার এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাচ্ছিলেন। সন্তাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে তিনি আহত হন। কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে তিনি সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে যান।

চেয়ারম্যান বাবু পরিতোষ চাকমা, উক্ত ইউনিয়নের মহিলা সদস্য গোপা দেবী চাকমা, বাবুছড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপুলেশ্বর চাকমা প্রমুখ।

দীঘীনালা ও কাউখালিতে এইচ.ডব্লিউ.এফ শাখা গঠিত

১৫ ফেব্রুয়ারী হুজুলি চাকমাকে আহ্বায়ক, ধনপুদি চাকমাকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও চিক্কাবী চাকমাকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দীঘীনালা থানা কমিটি গঠন করা হয়েছে। শান্তিনিবাস বৌদ্ধ বিহার প্রাক্তনে এক মত বিনিময় সভা শেষে এই কমিটি গঠন করা হয়। সোনালী চাকমা, দীপংকর চাকমা ও মলিনা চাকমা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, ৬ ফেব্রুয়ারী রাস্তামাটির কাউখালি থানায়ও একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির আহ্বায়ক হলেন যুবলিকা চাকমা, যুগ্ম আহ্বায়ক থুই পাইচিং মার্মা ও সদস্য সচিব আলো চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অবিলম্বে জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবি পূর্ণস্বায়ত্তশাসন মেনে নিতে হবে। তারা নতুন করে সেনা ক্যাম্প নির্মাণের অভিযোগ করে বলেন, অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে ও ভূমি বেদখল বন্ধ করতে হবে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী সোনালী চাকমা অভিযোগ করে বলেন, বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী ও জনসংহতি সমিতির সদস্যরা সমাবেশে আসতে নারীদের বাধা প্রদান করেছে। পানছড়ি থানা ও অন্যান্য এলাকায় শত শত নারীকে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। সমাবেশ শেষে ঐতিহ্যবাহী পোষাক পিনোন খাদি ও থামি পড়ে শত শত নারী র্যালীতে যোগ দেয়। র্যালীটি স্বনির্ভর বাজার থেকে শুরু হয়ে চেসী স্কোয়ার হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আবার স্বনির্ভরে এসে শেষ হয়।

এরপর জেএসএস সদস্যরা তাকে হাজাছড়া ধর্মোদয় বৌদ্ধ বিহার থেকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এই বিহার থেকেই শ্রমণ অবস্থায় সশস্ত্র জেএসএস সদস্যরা ইউপিডিএফ কর্মি নিরুপম চাকমা ও চন্দ্র মোহন চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল। জেএসএস সদস্যরা তাকে অপহরণ করতে ব্যর্থ হয়, কারণ এ সময় বিহারে আরো অনেক লোক সমবেত ছিলেন। বীর চাকমা সন্তাসীদের ভেদ করে বোট দিয়ে কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

জেএসএস সদস্যরা আরো একবার তাকে তার গ্রামের বাড়ি থেকে অপহরণের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। সে বারও তিনি ভাগ্যক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। বীর চাকমা ও তার পরিবারের ওপর প্রতিদিন মৃত্যুর হুমকি আসতে থাকে। হয় এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে, না হয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে - এই ছিল সন্ত্রাসী লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সদস্যদের নির্দেশ। অবশেষে গত বছর মার্চ মাসে তিনি বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে এলাকা ছেড়ে কুদুকছড়িতে চলে আসেন। তাদের সাথে আরো ছয় পরিবারও জেএসএস গুণ্ডাদের অত্যাচারে ঠিকতে না পেরে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরা হলেন নীহার বিপু চাকমা, সুবর্ণ বিহার চাকমা, কল্লতরু চাকমা, বিদ্যুত চাকমা, জ্যোতিলেশ্বর চাকমা ও রশ্মি চাকমার পরিবার। কুদুকছড়িতে এসেও বীর চাকমার শেষ রক্ষা হলো না। জাতীয় বেঙ্গিমান সন্ত্রাসীরা তার প্রাণ কেড়ে নিল।

বিউটি চাকমার প্রশ্ন কি অপরাধ করেছে তার স্বামী বীর চাকমা? সে তো ইউপিডিএফ-এরও সক্রিয় সদস্য ছিল না? হতে পারে তিনি জেএসএস-এর কার্যকলাপকে সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে তাকে সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র সন্তাসীদের হাতে এভাবে খুন হতে হবে কেন?

তার মতো সাধনা চাকমারও একই প্রশ্ন। তার স্বামী জ্যোতিলেশ্বর চাকমাকে জেএসএস সদস্যরা খুন করে। প্রথমে তাকে ও ইউপি সদস্য নীতিময় চাকমাকে ২০০৩ সালের ২৭ এপ্রিল অপহরণ করা হয়। তার পরদিন নীতিময় চাকমার শপথ নেয়ার কথা ছিল। যখন তাদেরকে অপহরণ করা হয় তখন রাত ৯টা।

সাধনা চাকমা বলেন, "অপহরণের পর পরই আমবা

বাদলছড়িতে জেএসএস এর স্থানীয় নেতা ও রাস্তামাটিতে আঞ্চলিক পরিষদে যোগাযোগ করি। কিন্তু তারা অপহরণের কথা বোলানো অস্বীকার করে। তারা বলে যে তারা জ্যোতিলেশ্বর ও নীতিময় চাকমাকে অপহরণ করেনি। অপহরণের পর আমাদের ওপরও তারা কড়া নজর রাখতো। এমনকি এলাকার ইউপি চেয়ারম্যানের সাথেও কথা বলতে দিত না। তারাই অপহরণ করেছে, আবার তারাই আমাদের কাছে এসে বন্দুক তাক করে জিজ্ঞেস করতো: তোমাদের বাড়ির পুরুষ সদস্যরা কোথায়? এভাবে আমাদের হয়রানি ও ভীতির মধ্যে রাখা হতো।"

সাধনা আরো জানান, তাদের ৫ একর সেগুণ বাগান ও ৩ একর গামাটা ও অন্যান্য গাছের বাগান ছিল। জেএসএস সদস্যরা গামাটা গাছগুলো সব বিক্রি করে দিয়েছে, আর সেগুণ বাগানে চারাগুলো সব ধ্বংস করে দিয়েছে। এছাড়া তাদের বাড়ির সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে এবং গরু ছাগল হাঁস মুরগীগুলো খেয়ে দিয়েছে।

তার ধারণা তার স্বামী ও নীতিময় চাকমাকে সন্ত্রাসীরা মারামারি সন্তাসীরা খুন করেছে।

সাধনা চাকমার দুই ছেলে। বড় ছেলে নিউটন নবম শ্রেণীতে পড়ছে। অন্য ছেলের নাম টিটো। সে পড়ছে চতুর্থ শ্রেণীতে। অপহৃত হওয়ার পর জেএসএস-এর লোকজনের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত হুমকি আসায় তিনি তার ছেলের নিয়ে মাইসছড়ির বেতছড়িতে আশ্রয় নেন। সেখান থেকেও তাদেরকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। বর্তমানে তিনি অস্থায়ীভাবে কুদুকছড়ির হেডম্যান পাড়ায় বসবাস করছেন।

ইউপিডিএফ সদস্য যুদ্ধমনি চাকমার বিধবা স্ত্রী সঞ্জিতা চাকমা বলেন তার স্বামিকে গত ১৯ জানুয়ারী গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। এর জন্য তিনি জনসংহতি সমিতির অন্তর্ধারী সদস্যদের দায়ি করে বলেন, তাদের কোন রাজনৈতিক আদর্শ নেই। ডাকাত দলের সাথে তাদের কোন পার্থক্য নেই। সন্ত্রাসী লারমার পরমত সহিষ্ণুতা থাকলে চলমান ভ্রাতৃত্বাতি সংঘাত সহজেই বন্ধ করা যেতো।

সন্ত্রাসী লারমার কাছে এই তিন মহিলার আহ্বান, ভবিষ্যতে যাতে তাদের মতো অন্য কাউকে বিধবা হতে না হয়, যাতে আর কোন মায়ের কোল খালি না হয়, সেজন্য অচিরেই ইউপিডিএফ এর সাথে সমঝোতায় আসুন।